ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)

গণিত ও যুক্তি

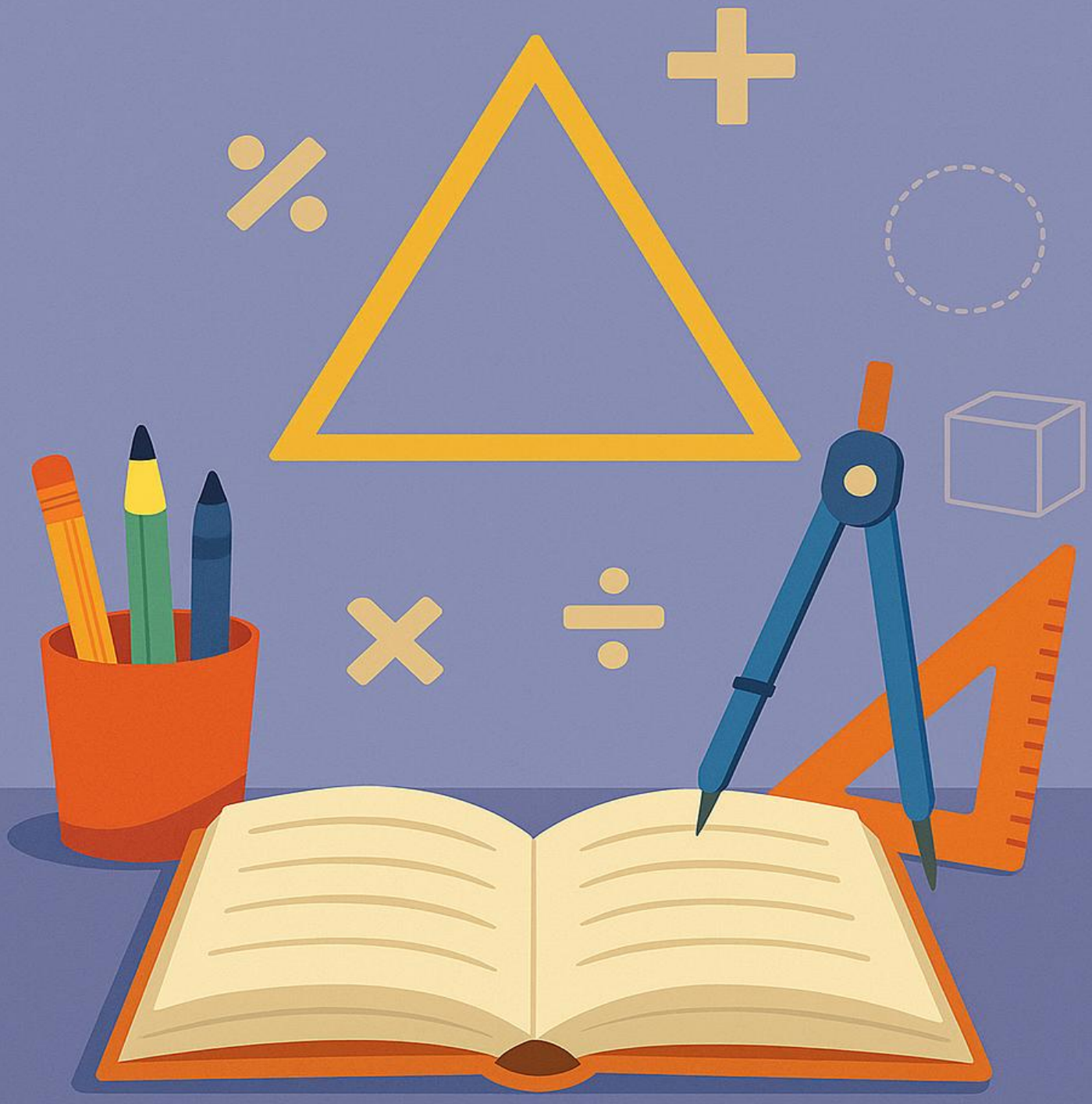

প্রশিক্ষণ গবেষণা উন্নয়ন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

গণিত ও যুক্তি

লেখকবৃন্দ

মো: মাজাহারুল ইসলাম খান, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
খান মো: কামরুজ্জামান মারুফ, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই মেহেরপুর
মো: ইমতিয়াজ শামীম চৌধুরী, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই দিনাজপুর
মোহাম্মদ উল্লা পাটওয়ারী, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই মাইজদি, নোয়াখালি
মো: সাদিক হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
নাছরিন জাহান, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই কুমিল্লা

সম্পাদক

মো: মাজাহারুল ইসলাম খান, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক সহযোগিতা

মোহাম্মদ কামরুল হাসান, এনডিসি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

দিলরুবা আহমেদ, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সার্বিক তত্ত্বাবধান

ফরিদ আহ্‌মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

প্রচ্ছদ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৬

মুখবন্ধ

শিক্ষা একটি চলমান ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষা ব্যক্তির আচরণে ইতিবাচক ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তার সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করে এবং তাকে দক্ষ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি দেশ ও জাতির উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলা। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ১০ মাস মেয়াদি **ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম** পরিচালিত হচ্ছে। এটি কোনো চাকরিকালীন বা চাকরিসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম নয়। বরং এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক।

ডিপিএড প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হবে। অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাদর্শন, শিখনতত্ত্ব, শিক্ষার কাঠামো ও প্রশাসন, শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা-বিষয়ক সমসাময়িক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর ও বাস্তবভিত্তিক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞানের যুগপৎ সমন্বয় থাকাতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভের পাশাপাশি এ সকল বিষয়বস্তু কীভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনে উপস্থাপন করতে হবে তাও আয়ত্ত করতে পারবে। ডিপিএড প্রোগ্রামে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুশীলনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞান সরাসরি প্রয়োগ করে হাতে-কলমে অনুশীলনের সুযোগ পাবে।

এই তথ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করা যায়, এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে এবং পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, পাঠ্যপুস্তকটি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে এই প্রত্যাশা রইল।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

বাণী

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি বিকাশের পাশাপাশি তাকে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন এমন মানবসম্পদ, যারা জ্ঞাননির্ভর, মূল্যবোধসম্পন্ন এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। এই মানবসম্পদ গঠনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা, যা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের ভিত্তি রচনা করে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পেশাগত প্রস্তুতি, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়; কার্যকর শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুসংগঠিত একাডেমিক প্রস্তুতি, আধুনিক শিক্ষণ ধারণা ও পেশাগত মূল্যবোধের সমন্বয়। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার জন্য মানসম্মত একাডেমিক প্রোগ্রামের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাগত ভূমিকা পালনে সহায়ক হতে পারে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তি, শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এবং পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সমন্বিত ধারণা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষা পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এসব পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তবমুখী শিক্ষা ধারণা অর্জন করবে এবং সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা বা পরিমার্জনের সুযোগ পরিলক্ষিত হলে তা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠনমূলক পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, আমি আশা ও বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে একটি দৃঢ় ও ফলপ্রসূ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

শিক্ষা মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও জীবনব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। এটি মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধের সমন্বিত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এবং তাকে মানবিক, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একটি জাতির সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে তার শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানের ওপর। এই শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে, যা শিশুর সার্বিক বিকাশের সূচনালগ্ন হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ, নীতিবান ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের গুণগত মানে প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশায় চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ বা পেশাগত অভিজ্ঞতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে পারেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথ বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ পেলেও পেশাগত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে শিক্ষকদের যেমন দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি তা শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে, যা বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য একটি সুদৃঢ় একাডেমিক ভিত্তি ও পেশাগত সক্ষমতাসম্পন্ন জনবলের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হতে পারে; অর্থাৎ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী জনবল তৈরি হবে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মৌলিক ধারণা, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো, শিখন প্রক্রিয়া, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান, পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সীমিত মানবীয় প্রচেষ্টার কারণে এতে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে তা সংশোধনের লক্ষ্যে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। সর্বোপরি, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং যে উদ্দেশ্যে এটি প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণিত ও যুক্তি

সুচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও গাণিতিক সাক্ষরতা	০৭
২	প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রম	১২
৩	গণিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা	১৬
৪	গণিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	২২
৫	সংখ্যা ও স্থানীয়মান	৩১
৬	প্রাথমিক চার নিয়ম	৪১
৭	ভগ্নাংশ	৫৯
৮	গুণিতক ও গুণনীয়ক	৬৭
৯	শতকরা ও গড়	৭৩
১০	পরিমাপ	৭৮
১১	জ্যামিতি ও প্যাটার্ন	৮৭
১২	উপাত্ত	৯৭
১৩	গণিত শিক্ষা উপকরণ	১০১
১৪	গণিত শিখন মূল্যায়ন	১০৭
১৫	পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পাঠ উপস্থাপন	১১৬

অধ্যায় ১
গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও গাণিতিক সাক্ষরতা

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যবিহীন কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। শিক্ষারও নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। সে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিশুর জন্য অধীত বিষয়বস্তুর শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে বাংলাদেশে প্রাথমিক গণিত শিক্ষার লক্ষ্য হলো এই স্তরের শিক্ষার্থীদের কল্পনা, কৌতুহল, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির বিকাশে প্রয়োজনীয় গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন এবং যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা। প্রাথমিক গণিত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ধারণা, পরিমাপ, যুক্তি ও সমস্যা সমাধানের মৌলিক দক্ষতা গড়ে তোলে। দৈনন্দিন জীবনে গণিতের কার্যকর ব্যবহার এবং যৌক্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার বিকাশ সাধন করা প্রাথমিক গণিত শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। সহজ ও আনন্দদায়ক শেখার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গণিত শিক্ষার জন্য শক্ত ভিত্তি তৈরি করে।

গাণিতিক সাক্ষরতা হলো বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা বোঝা, বিশ্লেষণ করা এবং গণিতের জ্ঞান ও কৌশল ব্যবহার করে তা সমাধান করার সক্ষমতা। এটি শুধু গণনা-নির্ভর দক্ষতা নয়; বরং যুক্তিবাদী চিন্তা, অনুমান, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গণিতকে বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার ক্ষমতা গড়ে তোলে। তাই শিক্ষার সকল স্তরে গাণিতিক সাক্ষরতা অর্জন বর্তমান সময়ের অন্যতম অপরিহার্য চাহিদা। এই অধ্যায় অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও গাণিতিক সাক্ষরতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করবে বলে আশা করা যায়।

গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য

গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্যকে মূলত ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১। ব্যবহারিক উদ্দেশ্য
২। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উদ্দেশ্য
৩। শৃঙ্খলামূলক ও যৌক্তিক উদ্দেশ্যে

১। ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: গণিত শিক্ষার ব্যবহারিক উদ্দেশ্যকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

ক) দৈনন্দিন প্রয়োজনে গণিতের ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় গণিতের ব্যবহার অবিচ্ছেদ্য। গণনায়, সকল প্রকার পরিমাপে, আকার আকৃতি প্রকাশে, ক্রয়-বিক্রয় ও সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনে গণিত ব্যবহৃত হয়। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি ইত্যাদি তৈরি, ব্যাংক, অফিস ও কৃষিকাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে গণিতের জ্ঞান প্রয়োজন। ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও জাতীয় বাজেটে, সময়, দূরত্ব, মজুরি, কমিশন ইত্যাদি নির্ধারণে এবং গবেষণা ও পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে গণিত অপরিহার্য।

খ) যোগাযোগ বা ভাবের আদান প্রদান ও যাতায়াতে গণিতের ব্যবহার

সাধারণভাবে যোগাযোগ বলতে সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান চলাচলকে বোঝায়। এছাড়া যোগাযোগ বলতে ভাবের বা তথ্যের আদান প্রদানকেও বুঝায়। এ সকল ক্ষেত্রে গণিত ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে আমরা রেডিও, টেলিফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ব্যবস্থা, সংবাদপত্র ইত্যাদির উল্লেখ করতে পারি। প্রতিটি মাধ্যমে যে চালিকাশক্তি কাজ করছে তা **হলো** গণিত। বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির যে বিস্ফোরণ ঘটেছে এর মূলেও রয়েছে গণিত। যাতায়াত ও পরিবহনের ক্ষেত্রে গণিতের অনেক ব্যবহার রয়েছে। যানবাহনের গঠন, এর পরিচালনার নিয়ম-কানুন, সময়সূচি, টিকিট ক্রয়-বিক্রয়, যাত্রাপথ, দূরত্ব নির্দেশক ফলক, দিক নির্দেশক যন্ত্র, চলন্ত অবস্থার গতি ও গতিপথ নিয়ন্ত্রণসহ যাতায়াত ব্যবস্থার সকল প্রকার আর্থিক ও সাধারণ হিসাব নিকাশে গণিতের ব্যবহার অপরিহার্য।

গ) পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে গণিত

জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষের পেশা বিচিত্র রকমের। কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি ইত্যাদি মানুষের প্রধান পেশা। কৃষিকাজে বীজ ও সারের পরিমাণ, জমির মাপ, উৎপন্ন ফসলের হিসাব, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি, সঞ্চয়, মূলধন, লাভ-লোকসান নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণিতের ব্যবহার রয়েছে। চাকুরির ক্ষেত্রে বেতন, ভাতা, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট, পেনশন ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণিতই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। গণিতের জ্ঞান ছাড়া কোন পেশাতেই উৎকর্ষ লাভ করা যায় না।

ঘ) অন্যান্য বিষয় শেখায় গণিতের ব্যবহার

শিক্ষাক্ষেত্রে সকল বিষয়ের সাথে গণিতের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি নিয়ম কানুন ও সূত্র গণিতের সঠিক পরিমাপের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোতেও গণিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে। ভাষা শিক্ষার বর্ণ, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি গঠনে গণিত কাজে লাগে। চারু ও কারুকলার বিভিন্ন কাজে গাণিতিক জ্ঞান অপরিহার্য। নানা রকম হাতের কাজে গাণিতিক জ্ঞান কাজে লাগানো হয়। সঙ্গীতের সুর, তাল, লয়, ছন্দ ইত্যাদি গাণিতিক নিয়মে আবদ্ধ। শারীরিক শিক্ষায় খেলার সামগ্রী, খেলার মাঠ, খেলোয়াড়ের সংখ্যা, খেলার নিয়ম কানুন ইত্যাদির জন্য গণিতের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২। গণিত শিক্ষার সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উদ্দেশ্য: গণিত শিক্ষার সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উদ্দেশ্যকে ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

ক) সৌন্দর্য বিকাশে গণিত

প্রকৃতির একটি নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে যা নদী-নালা, সাগর, পাহাড়, গাছপালা ফুলে ফলে বিরাজমান। এ সৌন্দর্য মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি, দালান কোঠা, পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদিতে পরিস্ফুটিত হয়। গণিত শিক্ষার্থীদের মাঝে এ সৌন্দর্যবোধ জাগাতে সাহায্য করে। আবহমানকাল থেকে গণিতের ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি জ্যামিতিক চিত্রগুলো আদর্শ সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে গণ্য হয়ে আসছে। তাই মিশরের পিরামিড, আগ্রার তাজমহল, রোমের সেন্ট পিঁটার্স গীর্জা, তুরস্কের আয়াসুফিয়া মসজিদ, চিত্রকর্ম মোনালিসা ইত্যাদিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে গাণিতিক অনুপাত ও প্রতিসাম্য। গাণিতিক নিয়ম মেনে চলা হয়েছে বলেই মানুষের তৈরি এসব জিনিস এত সৌন্দর্যমন্ডিত।

খ) সভ্যতার বিকাশে গণিত

গণিতকে বর্তমান সভ্যতার মেরুদন্ড বলা যেতে পারে। প্রাচীন কাল থেকেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি, প্রকৌশল বিদ্যা, নৌবিদ্যা, বিমান চালনা, আকাশ জয়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান, রেলপথ, গগনচুম্বী ভবন নির্মাণ ইত্যাদিতে গণিত বিশেষ অবদান রেখে চলছে ও চলবে। সভ্যতার বিশেষ উপাদান হলে সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের সাথে গণিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে গণিতের অবদান অপরিসীম।

গ) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে গণিত

গণিত যুক্তি ও সত্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। ভুল বা অসত্য তথ্য নিয়ে কাজ করলে গণিতে কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না। তাই গণিত শিক্ষা শিশুর মনে আত্ম-প্রত্যয়ের উন্মেষ ঘটায় যা শিশুর নৈতিক বিকাশে সহায়তা করে। এর ফলে পরবর্তীতে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অসত্য তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে পারে। গাণিতিক জ্ঞান শিশুর মধ্যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। গণিতের বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়া অসীমকে নির্দেশ করে। সংখ্যা গণনায় ১,২,৩.....ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে ভাবতে শিশুর মনে অসীমের ধারণা জন্মে। শিশুর এ ধারণা সৃষ্টিকর্তা ও তার অসীমতা সম্পর্কে ধারণা পেতে সহায়ক হয়।

৩। গাণিত শিক্ষার শৃঙ্খলামূলক ও যৌক্তিক উদ্দেশ্য: গণিত শিক্ষার শৃঙ্খলামূলক ও যৌক্তিক উদ্দেশ্যকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

ক) সরলতা ও সততায় গণিত

গণিতে অস্পষ্টতা, মিথ্যা বা অসঙ্গতির কোন অবকাশ নেই। সঠিক গাণিতিক নিয়মের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সুশৃঙ্খল ও যৌক্তিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধান করতে হয়। সমস্যা সমাধানের পরও নির্ভুলতা ও যথার্থতা যাচাই করার সুযোগ থাকে। এভাবে গণিত পরোক্ষভাবে হলেও সৎ হতে শেখায়।

খ) যৌক্তিক চিন্তার বিকাশে গণিত

যুক্তির মাধ্যমে সত্য উদঘাটনে গণিত শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করে। মুখস্ত বিদ্যা দিয়ে গণিত শেখা যায় না। গণিতে গভীর মনঃসংযোগের সাথে প্রতিটি ধাপ পার হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত বা কাঙ্খিত ফলাফলে উপনীত হতে হয়। বলা যায় যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারার বিকাশে গণিত সহায়ক। যৌক্তিক চিন্তার বিকাশের জন্য আরোহী, অবরোহী, সংযোগ, বিনিময় ইত্যাদি বিধি চর্চার ক্ষেত্র গণিত।

গ) মৌলিক চিন্তার বিকাশে গণিত

এটা সর্বজনবিদিত যে মুখস্থ করে গণিত শেখা যায় না। গণিতের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মৌলিক বা নিজস্ব চিন্তা ধারার বিকাশ। নিজস্ব চিন্তাধারার প্রয়োগ করতে না পারলে বা মৌলিক চিন্তা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারলে গণিতের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য মৌলিক চিন্তা ধারার বিকাশের মাধ্যমে গণিতের জানা নিয়মগুলো থেকে সঠিক নিয়মটি নির্বাচন করে সমস্যা সমাধান করা শিশুর পক্ষে সহজ হয়।

ঘ) আত্ম-মূল্যায়ন ও আত্ম-সমালোচনায় গণিত

গণিত শিক্ষার্থীদেরকে আত্ম-মূল্যায়ন ও আত্ম-সমালোচনা করতে শেখায়। গণিতের প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট ও অনন্য। গণিতের ফলাফলে কোন মতামতের অবকাশ না থাকার কারণে নির্দিষ্ট ফল লাভের জন্য একাগ্র মনে কাজ করে যেতে হয় এবং নির্দিষ্ট ফল লাভ করতে ব্যর্থ হলে নিজের কাজ আবার দেখতে ও উত্তরের শুদ্ধতা যাচাই করতে হয়। এভাবে শিশুর আত্ম-মূল্যায়ন ও আত্ম-সমালোচনার সুযোগ ঘটে।

গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চিন্তার বিকাশ, সমস্যা সমাধান ও বাস্তব জীবনে গণিতের প্রয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এতে তারা ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করবে।

গাণিতিক সাক্ষরতা

একজন শিক্ষার্থীর জন্য ভাষাগত সাক্ষরতা বা Language Literacy এর মতো গাণিতিক সাক্ষরতা বা Mathematical Literacy অর্জনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণে গণিতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সক্ষমতাই গাণিতিক সাক্ষরতা। গাণিতিক সাক্ষরতা (Mathematical Literacy) বলতে অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের সমন্বয়কে বোঝায় যা একজন শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গণিতের ধারণা ও পদ্ধতি ব্যবহার করতে সক্ষম করে। একজন শিক্ষার্থী যখন তার গাণিতিক দক্ষতাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা অনুধাবন করতে পারে, বিভিন্ন গাণিতিক ধারণার যৌক্তিক বিশ্লেষণ করতে পারে এবং আত্ম বিশ্বাসের সাথে কার্যকরী উপায়ে গাণিতিক ধারণা ব্যবহার করতে পারে তখনই সে গাণিতিক ভাবে সাক্ষর বা Mathematically Literate বলে বিবেচিত হয়। এটি শুধু গণিত শেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গণিতের সাহায্যে যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করে। গাণিতিক সাক্ষরতা একটি অত্যাবশ্যকীয়

জীবনদক্ষতা, যা শিক্ষার্থীদের শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন অর্থব্যবস্থা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক ক্ষেত্রে) কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে।

তাই গাণিতিক সাক্ষরতা বলতে বোঝায়

- ✓ গাণিতিক ধারণা অনুধাবনের সক্ষমতা
- ✓ নম্বর, গ্রাফ, প্রতীক, চিত্র সম্বলিত তথ্যকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা
- ✓ গাণিতিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনের দক্ষতা এবং সর্বোপরি
- ✓ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা

গাণিতিক সাক্ষরতা পরিমাপের মানদন্ড

গাণিতিক সাক্ষরতা পরিমাপের ৩টি মানদন্ড রয়েছে।

(১) স্থানিক সাক্ষরতা (Spatial Literacy)

(২) সংখ্যাগত সাক্ষরতা (Numeracy)

(৩) পরিমাণবাচক সাক্ষরতা (Quantitative Literacy)

De Lange এর গাণিতিক সাক্ষরতার Tree- Structure টি নিচে তুলে ধরা হলো-

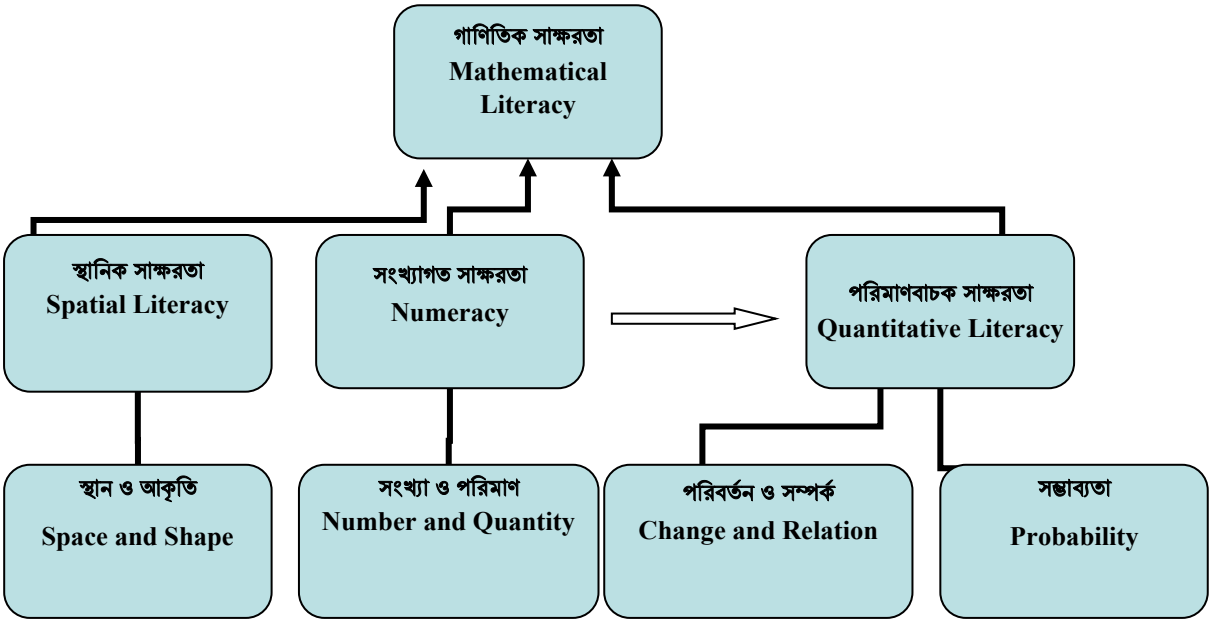

De Lange-এর গাণিতিক সাক্ষরতার Tree- Structure

স্থানিক সাক্ষরতা: যে ত্রিমাত্রিক জগতে ব্যক্তি বাস করে তার অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও আপেক্ষিক অবস্থান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধারণা অনুধাবন, বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগজনিত সক্ষমতাই হলো ব্যক্তির স্থানিক সাক্ষরতা। স্থানিক সাক্ষরতা অর্জনের প্রারম্ভিক লক্ষ্যে জ্যামিতিক জ্ঞান ও চিন্তন দক্ষতা অর্জনে সহায়তার জন্য প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রমে বিন্দু, রেখা, তল, লম্ব, সমান্তরাল রেখা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্ত সর্ম্পকিত বিভিন্ন প্রাথমিক ধারণা সংগঠন করা হয়।

সংখ্যাগত সাক্ষরতা: সংখ্যাগত সাক্ষরতার মাধ্যমে ব্যক্তির সংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়াজনিত ধারণা অনুধাবন, বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগজনিত সক্ষমতা প্রকাশ পায়। সংখ্যাগত সাক্ষরতা অর্জনের প্রারম্ভিক লক্ষ্যে প্রাথমিক গণিত

শিক্ষাক্রমে সংখ্যার মৌলিক ধারণা যেমন- সংখ্যা গণনা ও পড়া, জোড় ও বিজোড় সংখ্যা, মানসংখ্যা ও ক্রমসংখ্যা, স্থানীয় মান, সংখ্যার তুলনা, বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা; সংখ্যার প্রাথমিক চার নিয়ম - যোগ ও বিয়োগ, গুণ ও ভাগ, প্রাথমিক চার নিয়ম সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান; গড়ের ধারণা ও ব্যবহার; গ.সা.গু ও ল.সা.গু এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান; বিভিন্ন প্রকার ভগ্নাংশ, ভগ্নাংশের তুলনা, ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এবং দৈনন্দিন জীবনে এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান; দশমিক ভগ্নাংশের ধারণা, দশমিক ভগ্নাংশের স্থানীয় মান, দশমিক ভগ্নাংশের রূপান্তর ও ভগ্নাংশের তুলনা এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরিমাণবাচক সাক্ষরতা: ব্যক্তির পরিমানবাচক সাক্ষরতা বলতে বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যকার পরিবর্তন ও সর্ম্পক সংশ্লিষ্ট ধারণা অনুধাবন, বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগজনিত সক্ষমতা বোঝায়- যার মধ্যে সম্ভাব্যতার ধারণাও অর্ন্তভুক্ত। সংখ্যাগত সাক্ষরতা ও পরিমানবাচক সাক্ষরতার মধ্যে আন্ত: সর্ম্পক রয়েছে।
পরিমানবাচক সাক্ষরতা অর্জনের প্রারম্ভিক লক্ষ্যে প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রমে ঐকিক নিয়মে গাণিতিক সমস্যার সমাধান; শতকরার ধারণা, শতকরাকে ভগ্নাংশে এবং ভগ্নাংশকে শতকরায় রূপান্তর এবং শতকরার ব্যবহার (জনসংখ্যা, লাভ-ক্ষতি, মুনাফা); উপাত্ত উপস্থাপনে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণ, বিন্যস্ত ও অবিন্যস্ত উপাত্ত লেখচিত্রে (স্তম্ভচিত্র) উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ, জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান এবং সমস্যা তৈরি ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গাণিতিক সাক্ষরতা হলো দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা বিশ্লেষণ, যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তব প্রেক্ষাপটে গাণিতিক ধারণা প্রয়োগের সামগ্রিক সক্ষমতা। আধুনিক বিশ্বে প্রযুক্তি, তথ্যপ্রবাহ এবং জটিল সমস্যার বহুমাত্রিকতার কারণে গাণিতিক সাক্ষরতা প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য । এটি শুধু গণনা করার ক্ষমতা নয়; বরং সমস্যা বোঝা, সমাধানের কৌশল নির্বাচন, ফল বিশ্লেষণ এবং যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা উপস্থাপনের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় গাণিতিক সাক্ষরতার উন্নয়ন একটি টেকসই ও মানসম্মত শিক্ষার পূর্বশর্ত, যা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুশীলনী

১। গণিত শিক্ষার ব্যবহারিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২। গণিত শিক্ষার শৃঙ্খলামূলক ও যৌক্তিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৩। সংখ্যাগত সাক্ষরতা ও পরিমাণবাচক সাক্ষরতার মধ্যে কি মিল ও অমিল রয়েছে?
৪। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের গাণিতিক সাক্ষরতা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য ৫টি করণীয় উল্লেখ করুন।

অধ্যায়-২

প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রম

গণিত মানবজীবনের প্রতিদিনের কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের চিন্তা, সমস্যা সমাধান, হিসাব-নিকাশ ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে গণিতের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুদের মানসিক বিকাশে গণিত এমন এক বিষয় যা তাদের যুক্তিবোধ, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, এবং সৃজনশীল চিন্তার ভিত্তি গড়ে তোলে। তাই প্রাথমিক শিক্ষায় গণিত শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ সালে পরিমার্জিত হয়। শিশুর চাহিদা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পরবর্তীতে ২০২৫ সালে শিক্ষাক্রমটি পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। বর্তমান প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তুকে শুধু মুখস্থ করার পরিবর্তে ধারণাগত বোঝাপড়া, সমস্যা সমাধান, অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা, এবং কার্যভিত্তিক শেখা-কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিশুরা শেখার মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারে এবং গণিতকে বাস্তব জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে শেখে।

এই অধ্যায়ে প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রমের শিখনক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল ও শিক্ষাক্রমের ম্যাট্রিক্সে উল্লিখিত পদ্ধতি ও কৌশল, পরিকল্পিত কাজ, মূল্যায়ন টুলস ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক গণিতের শিখনক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা

শিখনক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা

শিখন ক্ষেত্র	যোগ্যতা
গণিত ও যুক্তি	১। গাণিতিক সংখ্যা ও প্রক্রিয়ার (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ) ধারণা লাভ করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করা। ২। জ্যামিতিক আকৃতি ও বিভিন্ন ধরনের পরিমাপের ধারণা লাভ করে প্রাত্যহিক জীবনে তা ব্যবহার করতে পারা। ৩। পর্যবেক্ষণ ও পারস্পরিক যোগাযোগের (মিথস্ক্রিয়া) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দক্ষতা অর্জন করা। ৪। দৈনন্দিন জীবনে সৃজনশীলতার সঙ্গে ইতিবাচক ও যৌক্তিকভাবে গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগ করে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্যা সমাধান করতে পারা।

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা

১। সংখ্যার ধারণা লাভ করে গণনা করতে এবং সংখ্যাকে বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজাতে পারা ও দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।

২। গাণিতিক প্রক্রিয়ার ধারণা লাভ করা এবং গাণিতিক যুক্তি ও সমাধানের ধাপের ধারাবাহিকতা (অ্যালগরিদম) বজায় রেখে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারা।

৩। ভগ্নাংশ ও শতকরার ধারণা লাভ করে দৈনন্দিন জীবনে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারা।

৪। মুদ্রা ব্যবহার করে দৈনন্দিন লেনদেন করা এবং সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়ে তা কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে পারা।

৫। গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রতীকের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যবহার জেনে গাণিতিক বাক্য গঠন করা ও সমস্যা সমাধান করতে পারা।

৬। জ্যামিতিক আকার ও আকৃতির ধারণা লাভ করে প্যাটার্ন অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে পারা এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে পারা।

৭। পরিমাপের ধারণা লাভ করে পরিমাপ করতে ও দৈনন্দিন জীবনে তা ব্যবহার করতে পারা।

৮। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করতে পারা এবং দৈনন্দিন জীবনে এ দক্ষতা প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা।

আবশ্যকীয় শিখনক্রম (প্রাথমিক গণিত)

শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী সহজ থেকে কঠিন ক্রম অনুসরণ করে গণিতের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাগুলোকে শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক এই বিভাজনই হলো শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বা আবশ্যকীয় শিখনক্রম । বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে শুরু হয়ে আরেকটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে শেষ হবে। যেমন, ১ নং যোগ্যতাটি অর্থাৎ সংখ্যা ও গণনার ধারণা শুরু হবে ১ম শ্রেণিতে এবং অর্জন শেষ হবে ৪র্থ শ্রেণিতে। আবার, ৩ নং যোগ্যতাটি অর্থাৎ ভগ্নাংশ ও শতকরার ধারণা ও সমস্যা সমাধান শুরু হবে ৩য় শ্রেণিতে এবং অর্জন শেষ হবে ৫ম শ্রেণিতে।

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১. সংখ্যার ধারণা লাভ করে গণনা করতে এবং সংখ্যাকে বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজাতে পারা ও দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।	১.১ উৎসাহের সাথে বিভিন্ন জিনিস তুলনা করে গণিতের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা।	-	-	-	-
	১.২ গণনার ধারণা লাভ করে উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন বস্তু গণনা করতে পারা।	-	-	-	-
	১.৩ সংখ্যা গণনা করতে, পড়তে, লিখতে ও তুলনা করতে পারা এবং উৎসাহের সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা।	১.৩ সংখ্যা গণনা করতে, পড়তে, লিখতে ও তুলনা করতে পারা এবং উৎসাহের সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারা।	-	-	-
	১.৪ স্থানীয়মানের ধারণা লাভ করে তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারা।	১.৪ স্থানীয়মানের ধারণা লাভ করে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধানে তা প্রয়োগ করতে পারা ।	১.৪ স্থানীয়মানের ধারণা ব্যবহার করে সংখ্যা পড়তে, লিখতে ও সংখ্যার তুলনা করতে পারা এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা ও ব্যবহার করতে পারা।	১.৪ স্থানীয়মানের ধারণা ব্যবহার করে সংখ্যা পড়া, অঙ্কে ও কথায় লিখতে পারা এবং সংখ্যার তুলনা করতে পারা ও ক্রমানুসারে সাজাতে পারা এবং দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা ও ব্যবহার করতে পারা।	-

প্রাথমিক গণিতের বিষয়ের আবশ্যকীয় শিখনক্রমের বৈশিষ্ট্য:

- আবশ্যকীয় শিখনক্রমে শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক ক্ষমতা এবং শেখার আগ্রহ অনুযায়ী যোগ্যতাগুলো সাজানো থাকে।
- প্রাথমিক স্তরে শুধু জ্ঞান নয়, বরং বুঝতে পারা, ব্যাখ্যা করা, হাতে-কলমে কাজ করা, সমস্যা সমাধান করা এসব সক্ষমতার উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিখনফল স্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে।
- কঠিন থেকে সহজ বিষয় এই নিয়মে শিক্ষাক্রম সাজানো ।
- শিক্ষার্থীর বয়স, বোধগম্যতা ও মানসিক বিকাশ বিবেচনা করে প্রতিটি শ্রেণির জন্য আলাদা যোগ্যতা নির্ধারিত আছে।

প্রাথমিক গণিতের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম

বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে প্রতিটি উপাদান পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল ও সুসমন্বিতভাবে সংগঠিত। বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা শিক্ষার্থীর দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতার লক্ষ্য নির্দেশ করে, আর সেই লক্ষ্যকে ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল। শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, যা শেখার প্রকৃতি অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত হয় মূল্যায়ন কৌশল, যাতে শেখার অর্জন যথাযথভাবে যাচাই করা যায়। আর এই মূল্যায়ন কৌশলই নির্ধারণ করে কোন মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করা হবে। এভাবে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা থেকে টুলস পর্যন্ত সকল উপাদান একটি ধারাবাহিক, যুক্তিসংগত কাঠামো গড়ে তোলে।

বিষয়ভি-ত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো কার্যাবলি		মূল্যায়ন নির্দেশনা	
				পদ্ধতি / কৌশল	পরিকল্পিত কাজ	পদ্ধতি	টুলস
১. সংখ্যার ধারণা লাভ করে গণনা করতে এবং সংখ্যাকে বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজাতে পারা ও দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।	১.১ উৎসাহের সাথে বিভিন্ন জিনিস তুলনা করে গণিতের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা।	১.১.১ কম-বেশি তুলনা করতে পারবে।	তুলনা	ছবি সম্পর্কে বলা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ প্রদর্শন আলোচনা	ছবি দেখে নিজের মতো করে বলা। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ এবং তুলনা করা। ছবি/ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস তুলনা ও পার্থক্য করা।	পর্যবেক্ষণ মৌখিক	চেকলিস্ট প্রশ্নমালা
		১.১.২ ছোট-বড় তুলনা করতে পারবে।					
		১.১.৩ খাটো-লম্বা তুলনা করতে পারবে।					
		১.১.৪ কাছে-দূরে নির্ণয় করতে পারবে।					
		১.১.৫ হালকা-ভারি তুলনা করতে পারবে।					
		১.১.৬ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করতে উৎসাহী হবে।					
	১.২ গণনার ধারণা লাভ করে উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন	১.২.১ গণনার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	গণনা	ভূল ধারণা যাচাই অনুশীলন	১ থেকে ১০ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে একে একে (প্রত্যেকে ১টি করে) হাত	পর্যবেক্ষণ মৌখিক	চেকলিস্ট প্রশ্নমালা
		১.২.২ অনধিক ১০টি বস্তু গণনা করতে পারবে।					

বিষয়ভি-ত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো কার্যাবলি		মূল্যায়ন নির্দেশনা	
				পদ্ধতি / কৌশল	পরিকল্পিত কাজ	পদ্ধতি	টুলস
	বস্তু গণনা করতে পারা।	১.২.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু গণনা করতে উৎসাহী হবে।		গণনার খেলা দলগত কাজ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ	তালির সঙ্গে বলা (Counting Routine) । ছড়া ও গানের তালে তালে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গণনা করা। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু (সর্বোচ্চ ১০টি) গণনা করা। ব্লক ব্যবহার করে গণনা করা।		

প্রাথমিক গণিতের বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য:

- গণিত বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা উল্লেখ করা আছে।
- শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে বিন্যস্ত করে প্রণীত শিখনফল অন্তর্ভূক্ত করা আছে।
- শিখনফলের আলোকে শিক্ষার্থীর জন্য পরিকল্পিত কাজের উল্লেখ করা আছে।
- পরিকল্পিত কাজগুলোর জন্য শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক কিছু পদ্ধতি ও কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে।
- যোগ্যতা অর্জন মূল্যায়নের জন্য পদ্ধতি ও টুলস ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এ শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন কার্যক্রমভিত্তিক শিখন, দলগত কাজ, বাস্তব উপকরণ ব্যবহার, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানমূলক শিখনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা শিশুদের যৌক্তিক চিন্তা ও গাণিতিক দক্ষতার বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত গণিতের যোগ্যতাসমূহের এই বিন্যাস শিশুর গাণিতিক দক্ষতা ধাপে ধাপে উন্নয়নে এবং একই সঙ্গে উচ্চতর শ্রেণিতে জটিল গণিত ধারণা শেখার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা করে।
সর্বোপরি, প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রম একটি শিশুকে সমন্বিতভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে যেখানে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সৃজনশীল সমস্যা সমাধান এবং সংখ্যার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। তাই ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন, দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সমাজে সফলভাবে চলার জন্য এটি এক অপরিহার্য ভিত্তি।

অনুশীলনী

১. পরিমার্জিত কারিকুলাম অনুযায়ী প্রাথমিক গণিতে শিক্ষার্থীর ভিত্তি গঠনে আবশ্যকীয় শিক্ষাক্রম কেন অপরিহার্য?
২. প্রাথমিক গণিতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষককে কোন কোন বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়? আবশ্যকীয় ও বিস্তৃত শিক্ষাক্রম উভয় প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৩. বিস্তৃত শিক্ষাক্রমের উপাদানুগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
৪. আবশ্যকীয় ও বিস্তৃত শিক্ষাক্রমের পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায়-৩
গণিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা

প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গণিত। এটি শিক্ষার্থীর যুক্তিবোধ, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং বাস্তব জীবনের নানা পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা গঠনে সহায়তা করে। গণিত শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজন একটি সুসংগঠিত শিক্ষাক্রম (Curriculum) এবং সেই অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তক (Textbook)। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পরস্পর পরিপূরক ও সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষাক্রম নির্ধারণ করে কী শেখানো হবে, কতটুকু শেখানো হবে এবং কীভাবে শেখানো হবে আর পাঠ্যপুস্তক সেই নির্দেশনাকে বাস্তব রূপ দেয়।

শিক্ষাক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষণ উপকরণ শিক্ষার্থীদের জন্য ধারাবাহিক, স্তরভিত্তিক এবং সহজবোধ্য শেখার পরিবেশ তৈরি করে। এতে প্রতিটি পাঠ নির্দিষ্ট শিক্ষাগত লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যায়, এবং শিক্ষক সহজে বুঝতে পারেন কোন দক্ষতা কখন ও কীভাবে শেখাতে হবে। ফলে শিক্ষণ-শেখার প্রক্রিয়া হয় সুশৃঙ্খল, পরিকল্পিত এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক।এই কারণে শিক্ষাক্রমের সাথে যথাযথ সামঞ্জস্যতা প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য, এবং এটি শিক্ষণ উপকরণকে কার্যকর, যুক্তিসঙ্গত ও অর্থবহ করে তোলে। এ অধ্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে প্রাথমিক গনিত(১ম-৫ম) শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন ও শিক্ষক সহায়িকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

গণিত পাঠ্যপুস্তক (১ম-২য় শ্রেণি)

প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রণীত সামগ্রীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষাক্রম, নির্ধারিত যোগ্যতা, শিখনফল বিবেচনা করেই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের অবশ্যই জানতে হবে-

- পাঠ্যপুস্তকে কী বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে?
- কীভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে?
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া কীরূপ?

প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার্থীর বয়স ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- সহজ থেকে জটিলে অগ্রসর হয়ে আগের ধারণার সাথে নতুন ধারণার সংযোগ।
- কার্যভিত্তিক ও অনুসন্ধানমূলক শিখনের সুযোগ আছে।
- হাতে কলমে কাজ, তুলনা, পরিমাপ, গণনা, চিত্র ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষাক্রমের শিখনফল অনুযায়ী সাজানো।
- প্রতিটি অধ্যায় নির্দিষ্ট দক্ষতা ও শিখনফলের সঙ্গে যুক্ত।
- চিত্রভিত্তিক উপস্থাপন ও ব্যবহারবান্ধব বিন্যাস।
- শিখন-শেখানোতে বৈচিত্র্য।
- খেলা, গল্প, আলোচনা, সমস্যা সমাধান, দলীয় কার্যক্রম এগুলোর সংযোজন।

১ম ও ২য় শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তক পরিচিতি:

প্রাথমিক শিক্ষায় গণিতের ভিত্তি হিসেবে ১ম ও ২য় শ্রেণির গণিত পাঠ্যসূচি শিশুদের মৌলিক সংখ্যা জ্ঞান, গণনা ক্ষমতা এবং যুক্তিবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী গণিত বিষয়কে শেখানো হচ্ছে হাতে-কলমে ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, যাতে শিশুরা গণিতকে ভয়ের বিষয় নয় বরং আনন্দময় শেখার অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। পাঠ্যসূচিতে সংখ্যা চেনা, যোগ-বিয়োগ, আকার-আকৃতি, দৈর্ঘ্য-পরিমাপ, সময় ও দৈনন্দিন

জীবনের সাধারণ গণিত ধারণাকে সহজ ও বয়সোপযোগীভাবে সাজানো হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের এই ভিত্তিমূলক পাঠ্যসূচিই পরবর্তী শ্রেণিগুলোর গণিত শেখাকে সুদৃঢ় ও স্বচ্ছ করে তোলে।

নিচে ১ম ও ২য় শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যসূচি দেয়া হলো-

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	তুলনা করি	১
২	গণনা	৫
৩	সংখ্যা (১ থেকে ১০)	৯
৪	যোগের ধারণা	২৯
৫	বিয়োগের ধারণা	৪৩
৬	সংখ্যা : ১১ থেকে ২০	৫৪
৭	যোগ (১১ থেকে ২০)	৫৮
৮	বিয়োগ (১১ থেকে ২০)	৬৬
৯	সংখ্যা (২১ থেকে ৪০)	৬৯
১০	স্থানীয় মান	৭৪
১১	নিজে করি	৭৯
১২	জ্যামিতি	৮২
১৩	প্যাটার্ন	৮৬
১৪	সংখ্যা (৪১ থেকে ১০০)	৯২
১৫	যোগ	৯৭
১৬	বিয়োগ	১০১
১৭	বাংলাদেশি মুদ্রা	১০৫
১৮	নিজে করি	১০৯

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	**সংখ্যা ও স্থানীয় মান**	
	সংখ্যা পড়ি ও কথায় লিখি (২১ থেকে ১০০)	১
	গণনা	৮
	সংখ্যার তুলনা	১৪
	স্থানীয় মান	১৭
	সংখ্যার তুলনা (স্থানীয় মানের সাহায্যে)	২২
	জোড়-বিজোড় সংখ্যা ও সংখ্যা প্যাটার্ন	২৫
	ক্রমবাচক সংখ্যা	৩৪
২	**যোগ ও বিয়োগ**	
	যোগ (১)	৪০
	বিয়োগ (১)	৪৬
	গাণিতিক সম্পর্ক (যোগ ও বিয়োগ)	৫৩
	যোগ (২)	৫৫
	বিয়োগ (২)	৬৪
	যোগ ও বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা	৬৯
৩	**গুণ**	
	গুণের ধারণা	৭৩
৪	**জ্যামিতিক আকৃতি ও প্যাটার্ন**	
	জ্যামিতিক আকৃতি	১০২
	প্যাটার্ন	১০৫
৫	**পরিমাপ**	
	দৈর্ঘ্য পরিমাপ	১০৭
	ওজন পরিমাপ	১১১
	তরলের আয়তন পরিমাপ	১১৪
	সময় পরিমাপ	১১৭
৬	**মুদ্রা**	
	বাংলাদেশি মুদ্রা	১২১
৭	**উপাত্ত**	
	উপাত্ত সংগ্রহ এবং সাজানো	১২৫

পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন (১ম-২য় শ্রেণি)

প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রমে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ন নির্দেশনা পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার্থী একটি শ্রেণিতে কোন স্তরের গণিতের দক্ষতা অর্জন করবে তা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনফল বাস্তবায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তকে উপযুক্ত উদাহরণ, কার্যক্রম, অনুশীলন, চিত্র ও সমস্যা দেওয়া হয়েছে।

নমুনা হিসেবে ১ম শ্রেণির গণিত বিষয়ের ১নং বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার অন্তর্গত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের সাথে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রতিফলন দেখানো হলো।

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সংখ্যার ধারণা লাভ করে গণনা করতে এবং সংখ্যাকে বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজাতে পারা ও দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।	১.১ উৎসাহের সাথে বিভিন্ন জিনিস তুলনা করে গণিতের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা।	১.১.১ কম-বেশি তুলনা করতে পারবে।	তুলনা
		১.১.২ ছোট-বড় তুলনা করতে পারবে।	
		১.১.৩ খাটো-লম্বা তুলনা করতে পারবে।	
		১.১.৪ কাছে-দূরে নির্ণয় করতে পারবে।	
		১.১.৫ হালকা-ভারি তুলনা করতে পারবে।	
		১.১.৬ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করতে উৎসাহী হবে।	

১ নং বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার অন্তর্গত শিখনফল

পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন:

১ম শ্রেণির তুলনা করি অধ্যায়

৩য়-৫ম শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তক পরিচিতি ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন

প্রাথমিক গণিতের ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীদের ভিত্তিমূলক দক্ষতা দৃঢ় করে ধাপে ধাপে উচ্চতর গণিত ধারণা গঠনের জন্য সাজানো হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এই শ্রেণিগুলোর পাঠ্যপুস্তকে সংখ্যার ধারণা, ভগ্নাংশ, গুণ-ভাগ, গাণিতিক প্রতীক, গুণিতক, গুণনীয়ক, গড়, ভগ্নাংশ, শতকরা, পরিমাপ, জ্যামিতিক আকৃতি, উপাত্ত এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।
নিম্নে ৩য়-৫ম শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যসূচি দেয়া হলো -

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	গুণ ও ভাগ	১
২	গাণিতিক বাক্য	১৭
৩	গুণিতক ও গুণনীয়ক	৩১
৪	সাধারণ ভগ্নাংশ	৪৯
৫	দশমিক ভগ্নাংশ	৬৩
৬	শতকরা	৯১
৭	গড়	১০৫
৮	পরিমাপ	১১৫
৯	জ্যামিতি	১৪৯
১০	উপাত্ত বিন্যস্তকরণ	১৭১

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	সংখ্যা	১
২	যোগ	২০
৩	বিয়োগ	২৯
৪	যোগ ও বিয়োগের সম্পর্ক	৩৪
৫	গুণ	৩৯
৬	ভাগ	৫৯
৭	গুণ ও ভাগের সম্পর্ক	৭৩
৮	যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগসংক্রান্ত সমস্যা	৭৮
৯	ভগ্নাংশ	৮৪
১০	বাংলাদেশি মুদ্রা	৯৯
১১	পরিমাপ	১১০
১২	জ্যামিতি	১২৩
১৩	উপাত্ত সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণ	১৩৭

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	সংখ্যা ও স্থানীয় মান	১
২	যোগ ও বিয়োগ	২৩
৩	গুণ	৪১
৪	ভাগ	৪৯
৫	গাণিতিক বাক্য	৬৭
৬	গুণিতক ও গুণনীয়ক	৮১
৭	সাধারণ ভগ্নাংশ	৯৭
৮	দশমিক ভগ্নাংশ	১১১
৯	পরিমাপ	১২১
১০	জ্যামিতি	১৪৩
১১	উপাত্ত সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণ	১৬৯

প্রাথমিক শ্রেণির গণিতে নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করতে হয়। সেই যোগ্যতার ভিত্তিতেই শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি পাঠ ও কার্যক্রম শিখনফলের সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্য রেখে সাজানো। বিষয়বস্তু, উদাহরণ ও অনুশীলন শিখনফল অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে পাঠ্যপুস্তক, বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক অর্জনপোযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ন নির্দেশনা মিলেই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মূল কাঠামো তৈরি করে।

নমুনা হিসেবে শিক্ষাক্রম থেকে ৫ম শ্রেণির গণিত বইয়ের সাথে ৬নং বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার অন্তর্গত শ্রেণিভিত্তিক অর্জনপোযোগী যোগ্যতা, শিখনফল , বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ন নির্দেশনার প্রতিফলন দেখানো হলো ।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
৬.৫ বৃত্ত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে উৎসাহের সঙ্গে এর বিভিন্ন অংশ আঁকতে ও চিহ্নিত করতে পারা।	৬.৫.১ বৃত্তের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	বৃত্ত
	৬.৫.২ উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করে বৃত্ত আঁকতে পারবে।	

৬ নং বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার অন্তর্গত শিখনফল

পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন:

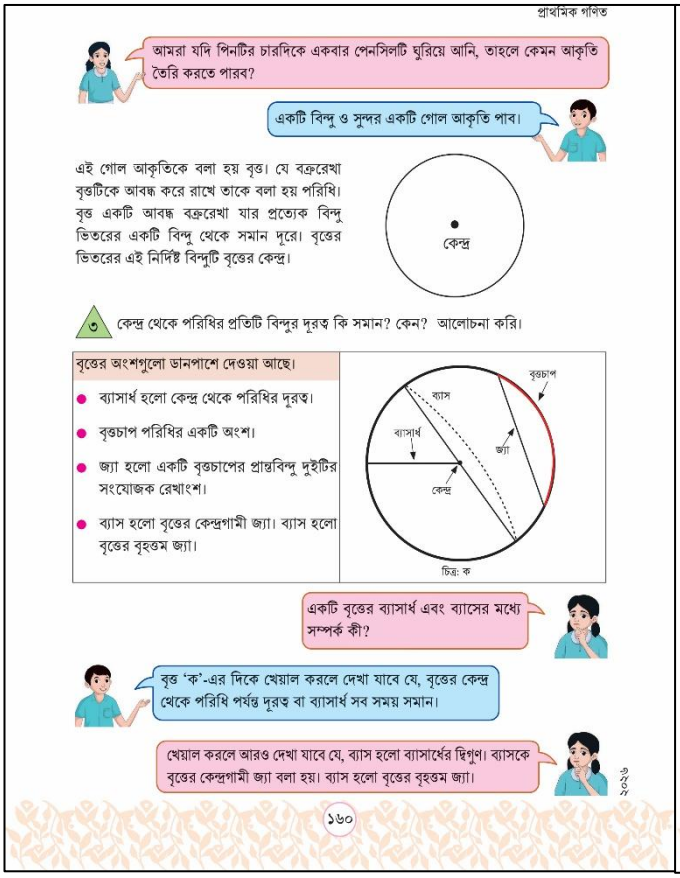
প্রাথমিক গণিত

আমরা যদি পিনটির চারদিকে একবার পেনসিলটি ঘুরিয়ে আনি, তাহলে কেমন আকৃতি তৈরি করতে পারব?

একটি বিন্দু ও সুন্দর একটি গোল আকৃতি পাব।

এই গোল আকৃতিকে বলা হয় বৃত্ত। যে বক্ররেখা বৃত্তটিকে আবদ্ধ করে রাখে তাকে বলা হয় পরিধি। বৃত্ত একটি আবদ্ধ বক্ররেখা যার প্রত্যেক বিন্দু ভিতরের একটি বিন্দু থেকে সমান দূরে। বৃত্তের ভিতরের এই নির্দিষ্ট বিন্দুটি বৃত্তের কেন্দ্র।

কেন্দ্র

৩ কেন্দ্র থেকে পরিধির প্রতিটি বিন্দুর দূরত্ব কি সমান? কেন? আলোচনা করি।

বৃত্তের অংশগুলো ডানপাশে দেওয়া আছে।

- ব্যাসার্ধ হলো কেন্দ্র থেকে পরিধির দূরত্ব।
- বৃত্তচাপ পরিধির একটি অংশ।
- জ্যা হলো একটি বৃত্তচাপের প্রান্তবিন্দু দুইটির সংযোজক রেখাংশ।
- ব্যাস হলো বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যা। ব্যাস হলো বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা।

ব্যাস, বৃত্তচাপ, ব্যাসার্ধ, জ্যা, কেন্দ্র

চিত্র: ক

একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং ব্যাসের মধ্যে সম্পর্ক কী?

বৃত্ত 'ক'-এর দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব বা ব্যাসার্ধ সব সময় সমান।

খেয়াল করলে আরও দেখা যাবে যে, ব্যাস হলো ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ। ব্যাসকে বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যা বলা হয়। ব্যাস হলো বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা।

২০২৩

১৬০

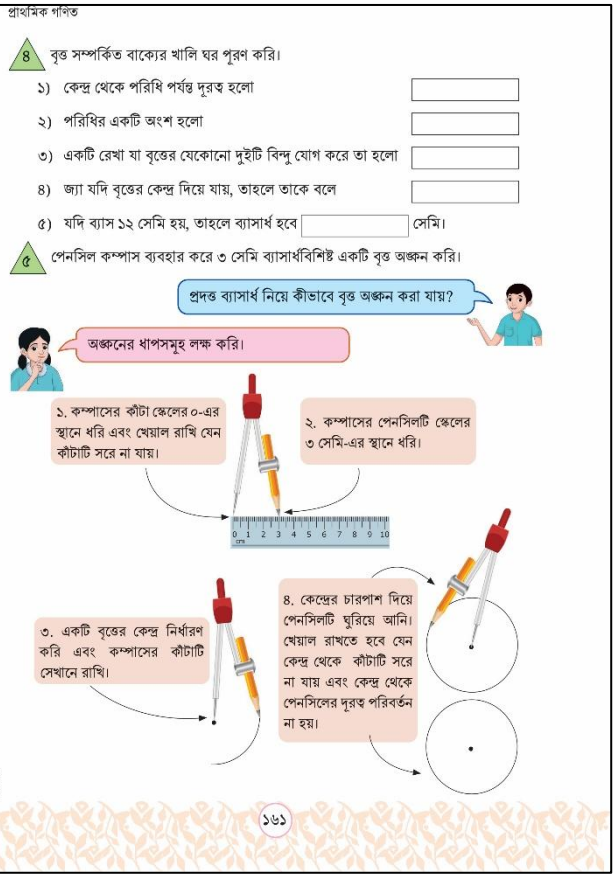
প্রাথমিক গণিত

৪ বৃত্ত সম্পর্কিত বাক্যের খালি ঘর পূরণ করি।

১) কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব হলো ____

২) পরিধির একটি অংশ হলো ____

৩) একটি রেখা যা বৃত্তের যেকোনো দুইটি বিন্দু যোগ করে তা হলো ____

৪) জ্যা যদি বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়, তাহলে তাকে বলে ____

৫) যদি ব্যাস ১২ সেমি হয়, তাহলে ব্যাসার্ধ হবে ____ সেমি।

৫ পেনসিল কম্পাস ব্যবহার করে ৩ সেমি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত অঙ্কন করি।

প্রদত্ত ব্যাসার্ধ নিয়ে কীভাবে বৃত্ত অঙ্কন করা যায়?

অঙ্কনের ধাপসমূহ লক্ষ করি।

১. কম্পাসের কাঁটা স্কেলের ০-এর স্থানে ধরি এবং খেয়াল রাখি যেন কাঁটাটি সরে না যায়।

২. কম্পাসের পেনসিলটি স্কেলের ৩ সেমি-এর স্থানে ধরি।

৩. একটি বৃত্তের কেন্দ্র নির্ধারণ করি এবং কম্পাসের কাঁটাটি সেখানে রাখি।

৪. কেন্দ্রের চারপাশ দিয়ে পেনসিলটি ঘুরিয়ে আনি। খেয়াল রাখতে হবে যেন কেন্দ্র থেকে কাঁটাটি সরে না যায় এবং কেন্দ্র থেকে পেনসিলের দূরত্ব পরিবর্তন না হয়।

২০২৩

১৬১

কাজেই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা একই ধারাবাহিক কাঠামোর পরিপূরক উপাদান। শিক্ষাক্রম নির্ধারণ করে শেখার লক্ষ্য, শিখনফল ও শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা, মূল্যায়ন নির্দেশনা। পাঠ্যপুস্তক সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ও কার্যক্রমকে সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপন করে আর শিক্ষক সহায়িকা শিক্ষকের জন্য পদ্ধতিগত নির্দেশনা, শিক্ষণ কৌশল ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা প্রদান করে। এ তিনটির সমন্বিত ব্যবহার শিক্ষার্থীর শেখার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসূ করে, এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেয়।

গণিত শিক্ষক সহায়িকা

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গণিত শেখানো একটি সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শিশুরা প্রথমবারের মতো সংখ্যা, পরিমাপ, জ্যামিতি এবং বিভিন্ন যুক্তিভিত্তিক ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয় এই স্তরেই। তাই শিক্ষণকে সহজ ও কার্যকর করতে একজন দক্ষ শিক্ষকের পাশাপাশি প্রয়োজন একটি উপযোগী শিক্ষক সহায়িকা।

প্রাথমিক গণিত শিক্ষক সহায়িকা শিক্ষককে পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষণ-পদ্ধতি, উপকরণ ব্যবহার, শ্রেণি কার্যক্রম, মূল্যায়ন কৌশলসহ নানা ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করে। এতে ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার স্তর অনুসারে কীভাবে পাঠ পরিচালনা করতে হবে তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা থাকে। ফলে শিক্ষক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে গণিতের পাঠ উপস্থাপন করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের শেখায় আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হন।

এই সহায়িকা কেবল পাঠদানের বই নয় এটি একটি বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা যেখানে শেখানো ও শেখার প্রক্রিয়া আরও গতিশীল, অংশগ্রহণমূলক ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। প্রাথমিক গণিত শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য।

পুস্তকের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোয় শিক্ষক সহায়িকার গুরুত্ব

- শিক্ষক সহায়িকা পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায় কীভাবে শেখাতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া থাকে। এতে পাঠের শিখনফল, মূল ধারণা ও সময়সূচি থাকে, যা শিক্ষককে কার্যকর পাঠ পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে।
- সহায়িকায় সাধারণত বিভিন্ন শিক্ষণ-পদ্ধতি (যেমন দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর, অনুসন্ধানমূলক কাজ) কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা উল্লেখ থাকে। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন।
- শিক্ষক সহায়িকায় এমন কার্যক্রম থাকে যা শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে। যেমন-অনুশীলনমূলক কাজ, আলোচনা ইত্যাদি।
- সহায়িকায় গঠনমূলক ও সমাপনী মূল্যায়নের উদাহরণ থাকে। শিক্ষক কোন শিখন-ফল কীভাবে মূল্যায়ন করবেন তা স্পষ্টভাবে জানতে পারেন।
- শ্রেণিকক্ষে কীভাবে কাজ বিভাজন করবেন, সময় ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার্থীর ভিন্ন ধরণের শেখার প্রেক্ষিতে কীভাবে পাঠ দেবেন এসব বিষয়ে সহায়িকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গণিত শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের কৌশল

প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু কার্যকরভাবে শেখানোর জন্য শিক্ষক সহায়িকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঠের আগে শিক্ষক সহায়িকা পড়ে পাঠের শিখনফল, পদ্ধতি ও কৌশল, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সহায়িকা অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে সময় ও কার্যক্রম ঠিক করা হয়। শ্রেণিকক্ষে খেলা, একক কাজ, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি কার্যক্রম প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। জটিল বিষয়গুলোর সহজ ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা বাড়ায়। এছাড়া মূল্যায়নের জন্য সহায়িকায় দেওয়া প্রশ্ন ও পর্যবেক্ষণ তালিকা ব্যবহার করে শেখার অগ্রগতি যাচাই করা হয়। পাঠ শেষে পর্যালোচনা করে শিক্ষক পাঠদানের দক্ষতা বৃদ্ধি করেন। এভাবে শিক্ষক সহায়িকার সঠিক ব্যবহার পাঠদানকে সুসংগঠিত, কার্যকর ও আনন্দদায়ক করে।

গণিত শিক্ষক সহায়িকা শিক্ষককে শুধু দিকনির্দেশনা দেয় না, বরং শিক্ষাকে অংশগ্রহণমূলক, আনন্দময় ও স্থায়ী করে তোলে। কারণ একজন দক্ষ শিক্ষক জানেন সহায়িকা একটি সহায়ক সামগ্রী যা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর জীবনের সাথে যুক্ত করে শেখনকে অর্থবহ করে তোলে।

অনুশীলন

১. একজন শিক্ষকের গণিত পাঠ্যপুস্তক পড়ার আগে শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহার করার কী কী সুবিধা আছে?
২. শিক্ষক সহায়িকা কীভাবে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও বাস্তবতার সাথে যুক্ত করে শিখন প্রক্রিয়া সহজ করে তোলে বিশ্লেষণ করি।
৩. শিক্ষাক্রম কীভাবে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে উদাহরণসহ লিখি।
৪. প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা আলোচনা করি।

অধ্যায় ৪
গণিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর কার্যকর শিখনের জন্য শিক্ষকের প্রস্তুতি যেমন অপরিহার্য তেমনি প্রয়োজন সঠিক পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন। পদ্ধতি বলতে কোনো একটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক কিছু নির্দেশনাকে বোঝায়। পদ্ধতির সার্থক বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন কৌশল। শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য একটি বিষয়বস্তুকে শিক্ষক নানাভাবে উপস্থাপন করেন। একজন শিক্ষক কেবলমাত্র কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এই উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারেন।

একজন শিক্ষক তার শ্রেণির শিক্ষাথীদের মেধা, বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে অবগত থাকেন। পাঠের বিষয়বস্তু কীভাবে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারবে তা তিনিই ভালো বুঝতে পারেন। বলা হয় Teacher is the best Method when he knows all Methods. অর্থাৎ একজন শিক্ষকের পদ্ধতিই সর্বোত্তম যদি তিনি সকল পদ্ধতি জানেন। কাজেই পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকের সম্যক ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

কোনো একটি পদ্ধতি বা কৌশল যত ভালোই হোক না কেন তা সকল বিষয়বস্তু পাঠদানের জন্য উপযোগী হতে পারে না। শিক্ষক উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করে পাঠদান করলে একদিকে শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যকর হয় অপর দিকে শিক্ষক পাঠদান করে নিজে সন্তুষ্টি অর্জন করেন। পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল হবে সর্বদা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক। আসলে যাঁরা পাঠদানের উৎকৃষ্ট কৌশলগুলিকে প্রয়োগ করে তারাই শিক্ষার্থীর কাছে ভালো শিক্ষক।

এই অধ্যায়ে প্রাথমিক স্তরের শিশুর গণিত শিখনে যান্ত্রিক ও সম্পর্কমূলক উপলব্ধির ধারণা, কয়েকটি পদ্ধতি ও কৌশল, যেমন, আরোহী-অবরোহী পদ্ধতি, আবিষ্কার পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, প্রকল্প ও অনুসন্ধানভিত্তিক পদ্ধতি এবং তাদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে যেকোনো পদ্ধতিই সাফল্য লাভ করবে প্রধানত শিক্ষকের চেষ্টা, আন্তরিকতা, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার উপর।

যান্ত্রিক উপলব্ধি ও সম্পর্কমূলক উপলব্ধি

শুধু নিয়ম বা সূত্র মুখস্থ করে গণিতের সমস্যা সমাধান করাকে যান্ত্রিক উপলব্ধি বলে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কীভাবে করতে হয় তা জানে, কিন্তু কেন করতে হয় সে ব্যাপারে গভীর ধারণা থাকে না। অথচ শিক্ষার্থীরা যখন কোনো গাণিতিক সমস্যা বুঝে শুনে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ কোথা থেকে শুরু করতে হবে, কী করতে হবে এবং কেন করতে হবে তা বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারে তখন শিক্ষার্থীর যে শিখন হয় তাকে সম্পর্কমূলক শিখন/উপলব্ধি বলে। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের গণিত শিখনের ক্ষেত্রে এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্কমূলক উপলব্ধি বা শিখন অধিক গ্রহণযোগ্য।

উদাহরণঃ দুইটি ঘণ্টার মধ্যে প্রথটি ৪ মিনিট অন্তর এবং দ্বিতীয়টি ৬ মিনিট অন্তর বাজে। ঘণ্টা দুইটি সকাল ৮ টায় একত্রে বাজে। পরবর্তী কোন সময়ে ঘণ্টা দুইটি একত্রে বাজবে?

সমাধানঃ যান্ত্রিক উপলব্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে-

ঘণ্টা দুটি সকাল ৮:০০ টায় একত্রে বাজার পর পরবর্তী একত্রে বাজার সময় হলো ৪ ও ৬ এর লসাগু।

৪ এর মৌলিক উৎপাদক: ২ × ২

৬ এর মৌলিক উৎপাদক: ২ × ৩

৪, ৬ এর লসাগু = ২ × ২ × ৩ = ১২

ঘণ্টা দুটি প্রতি ১২ মিনিট পর পর একসাথে বাজবে।

সকাল ৮:০০ টায় একসাথে বাজার পর, তারা আবার একসাথে বাজবে ৮:০০ + ১২ মিনিট = সকাল ৮:১২ টায়।

সম্পর্কমূলক উপলব্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে-

প্রথম ঘণ্টাটি বাজে: ৮:০০, ৮:০৪, ৮:০৮, ৮:১২, ৮:১৬, ৮:২০, ... (প্রতি ৪ মিনিট পর পর)

দ্বিতীয় ঘণ্টাটি বাজে: ৮:০০, ৮:০৬, ৮:১২, ৮:১৮, ৮:২৪, ... (প্রতি ৬ মিনিট পর পর)

অতএব, ৮:১২ টায় ঘণ্টা দুটি আবার একসাথে বাজবে।
উপর্যুক্ত পদ্ধতি দুটির মধ্যে প্রথমটির নিয়ম মুখস্থ করে শিক্ষার্থীরা লসাগু নির্ণয় করেছে। কিন্তু তারা প্রকৃত বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সকাল ৮টার পরে পরবর্তী কোন সময়ে ঘণ্টা দুটি একত্রে বাজবে তার মিল খোঁজার চেষ্টা করে ফলাফল নির্ণয় করেছে।

যান্ত্রিক ও সম্পর্কমূলক উপলব্ধির পার্থক্য

যান্ত্রিক উপলব্ধি	সম্পর্কমূলক উপলব্ধি
১. গুণের নামতা টেবিল মুখস্থ বলতে পারে এবং টেবিল ব্যবহার করে গুণ অঙ্ক করতে পারে।	১. গুণের ভেতর সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে দেখে এবং পরে গুণ করে, গুণের নামতা ব্যবহার করে।
২. সমতল আকার-আকৃতি চিহ্নিত করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে।	২. সমতল আকার-আকৃতির মধ্যে সম্পর্ক খুজতে বিভিন্ন দিক থেকে সহায়তা নেয়।
৩. ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশের গুণ ও ভাগ করতে পারে।	৩. ভগ্নাংশের গুণ ও ভাগের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে।
৪. ঐকিক নিয়মের সমস্যা সমাধান করতে পারে।	৪. সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমানুপাতিক সম্পর্ক সংখ্যার সাথে খুঁজে বের করে।
৫. আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নির্ণয় করে সমস্যা সমাধান করতে পারে।	৫. ছোট ছোট ক্ষেত্রফলের সমষ্টি নির্ণয় করে বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে।
৬. নিয়ম সংক্ষিপ্ত বলে সময় কম লাগে।	৬. নিয়মের ধারাবাহিকতা বেশি থাকে বলে সময় বেশি লাগে।
৭. এই পদ্ধতিতে একসাথে অনেক শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা যায়।	৭. এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ, তাই অনেক শিক্ষার্থীকে একসাথে মূল্যায়ন করা যায়না।
৮. কেবলমাত্র মখুস্থ করতে হয়। যন্ত্রের মতো ব্যবহার করা হয়।	৮. সমস্যা এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া বুঝতে হয়। সমস্যা সমাধানে তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়

সম্পর্কমূলক উপলব্ধি ব্যবহার করে শিখনে সুবিধা

- শিক্ষার্থীরা পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে সূত্র খুঁজে দেখতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা গণিতের বিষয়বস্তু খুব গভীরভাবে বুঝতে পারে।
- শিক্ষার্থী শিখনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করে।
- নতুন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে শেখা খুব সহজ।
- এতে খুব কম মুখস্থ করতে হয়।
- শিখনফল স্থায়ী হয়।
- সৃজনশীল ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি আকর্ষণ ও আনন্দ বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা/মেধা মূল্যায়ন করা সহজতর হয়।

সম্পর্কমূলক উপলব্ধির অনেক সুবিধা রয়েছে। তবুও বেশিরভাগ শিক্ষক গণিত শিখনে যান্ত্রিক উপলব্ধি ব্যবহার করেন। তবে যান্ত্রিক উপলব্ধির কোন উপযোগিতা নেই এটাও অবশ্য সঠিক নয়। নিচে যান্ত্রিক উপলব্ধির উপযোগিতা নিয়ে আলোকপাত করা হলো-

- নিজস্ব পটভূমিতে যান্ত্রিক উপলব্ধি ব্যবহার করে গণিতের অনেক বিষয়বস্তু বুঝতে অনেক সহজ। যেমন, দুইটি ভগ্নাংশের ভাগ যান্ত্রিক উপলব্ধিতে শেখানো খুব সহজ।
- এতে নতুন কাজে খাপ খাওয়ানো খুব সহজ।
- শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর খুব দ্রুত খুঁজে পায়।
- নির্দিষ্ট/স্বল্প সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করার জন্য বিদ্যালয়ের যথেষ্ট সময় থাকে না, তাই এটি অধিক জনপ্রিয়।
- যান্ত্রিক উপলব্ধির জন্য শিখনের সময় কম লাগে, এবং সম্পূর্ণ না বুঝে শিক্ষার্থী কম সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরদানে সক্ষম হয়।

সম্পর্কমূলক উপলব্ধি ও যান্ত্রিক উপলব্ধির প্রয়োগ

গাণিতিক সমস্যা সমাধানে সম্পর্কমূলক উপলব্ধি ও যান্ত্রিক উপলব্ধি উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। তবে যেকোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক হিসেবে নতুন ধারণা দিতে গেলে প্রথমে সম্পর্কমূলক উপলব্ধির ব্যবহারই শিশুর জন্য অধিক উপযোগী। তাই নতুনভাবে গাণিতিক কোনো ধারণা প্রদান করতে হলে সম্পর্কমূলক উপলব্ধি প্রয়োগ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঐ বিষয়ে ধারণা প্রদান করা প্রয়োজন। সম্পর্কমূলক উপলব্ধির ব্যবহার করতে গেলে প্রথমে শিক্ষককে বাস্তব জীবন থেকে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা বা পরিপ্রেক্ষিত সংগ্রহ করতে হবে। পরবর্তীতে এরূপ গাণিতিক সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায় শিক্ষার্থীদের সে সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করার সুযোগ দিতে হবে। চিন্তা করার পর সমস্যা সমধানে এগিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি এখান থেকে শিক্ষার্থী নিয়ম/সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে এবং পরবর্তীতে যে কোনো পরিস্থিতিতে/পরিপ্রেক্ষিতে এ সকল সূত্র ব্যবহার করতে পারবে।

সম্পর্কমূলক উপলব্ধির ব্যবহারে শিক্ষার্থী বাস্তব পরিবেশের কনটেক্স ও কনসেপ্ট সমন্বয়ের মাধ্যমে বুঝে-শুনে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে হয় বলে একটু সময় বেশি লাগাটাই স্বাভাবিক। যান্ত্রিক উপলব্ধিতে কেবলমাত্র সূত্র বা নিয়ম প্রয়োগ করতে হয় বলে সময় কম লাগে। তাই আমাদের দেশে শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে যান্ত্রিক উপলব্ধি বহুল ব্যবহার করে থাকেন। গাণিতিক সমস্যা সমাধানে কোন কনটেক্সে কী কী কনসেপ্ট ব্যবহার করতে হবে তথা কোন প্রক্রিয়ায় সমস্যাটি সমাধান করতে হবে তা বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহাই হলো সম্পর্কমূলক উপলব্ধি। সম্পর্কমূলক উপলব্ধিতে একজন শিক্ষার্থী পারদর্শী হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যান্ত্রিকভাবে সূত্র ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

আরোহী-অবরোহী ও আবিষ্কার পদ্ধতি

আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method)

যে পদ্ধতিতে উদাহরণ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্র বা সংজ্ঞা গঠন করা হয় তা হলো আরোহী পদ্ধতি। আরোহী পদ্ধতির ইংরেজি হলো Inductive Method। জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, সহজ থেকে কঠিন, বিশেষ থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া, উদাহরণ থেকে সূত্র গঠন করাকে আরোহী পদ্ধতি বলে।

কতগুলো উদাহরণ ভালোভাবে পরীক্ষা করে সেগুলো থেকে যদি যুক্তির সাহায্যে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বা সূত্র গঠন করা যায় তবেই আরোহী পদ্ধতি কার্যকর হয়। আরোহী পদ্ধতির মূল কথা হলো 'উদাহরণ থেকে সূত্র'।

অবরোহী পদ্ধতি (Deductive Method)

অবরোহী পদ্ধতি আরোহী পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনো সূত্র প্রয়োগ করে যে সত্য পাওয়া যায় তা নির্ধারণ করাই অবরোহী পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে কোনো একটি সাধারণ তথ্যকে স্বীকার করে বা প্রতিষ্ঠিত কোনো সত্য বা সূত্রকে ভিত্তি করে নতুন কোনো সত্যতা প্রমাণ করা হয় তাকে অবরোহী পদ্ধতি বলে। অল্প কথায় বলা যায় বিমূর্ত থেকে মূর্ত তথ্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি অবরোহী পদ্ধতি নামে খ্যাত।

এই পদ্ধতিতে 'সূত্র থেকে উদাহরণে' যাওয়া যায় বলে গণিতের কোনো সূত্রকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরলে তারা তা আয়ত্ত করে, তারপর সেটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রয়োগ করে বা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তার নির্ভুলতা নির্ণয় করতে পারে।

উদাহরণ: ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ...জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল কত?

আরোহী পদ্ধতিতে যোগফল নির্ণয় করি

২ = ২

২ + ৪ = ৬

২ + ৪ + ৬ = ১২

২ + ৪ + ৬ + ৮ = ২০

২ + ৪ + ৬ + ৮ +১০ = ৩০

.....

এখানে যোগফলগুলো ২, ৬, ১২, ২০, ৩০,.....

এগুলোকে এভাবে লিখা যায়

প্রথম ১টি জোড় সংখ্যার যোগফল ২ = ১ × ২ = ২

প্রথম ২টি জোড় সংখ্যার যোগফল ৬ = ২ × ৩ = ৬

প্রথম ৩টি জোড় সংখ্যার যোগফল ১২ = ৩ × ৪ = ১২

প্রথম ৪টি জোড় সংখ্যার যোগফল ২০ = ৪ × ৫ = ২০

.....

অনুরূপ ভাবে প্রথম n টি জোড় সংখ্যার যোগফল = $n \times (n+১)$

এখানে আমরা কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ থেকে একটি সাধারণ সূত্র বের করলাম এটাই আরোহী পদ্ধতি।

বিপরীত ভাবে অবোরহী পদ্ধতিতে প্রথম ৪ টি জোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করি।

আমরা জানি প্রথম nটি জোড় সংখ্যার যোগফল = $n \times (n+১)$ [এখানে n = ৪ হলে]

প্রথম ৪ টি সংখ্যার যোগফল = ৪× (৪+১)

= ৪ × ৫ = ২০

সাধারণ সত্য বা সূত্র থেকে শুরু করে বিশেষ সত্যতা বের করা। অর্থাৎ, একটি সাধারণ নিয়ম জানা থাকলে, সেই নিয়ম ব্যবহার করে কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করাই হলো অবোরহ পদ্ধতি।

আরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- কোনো সর্বজনীন সত্য বা সাধারণ সূত্র নির্ণয়ের জন্য কতকগুলো বিশেষ দৃষ্টান্তের সহায়তায় তার সত্যতা যাচাই করা হয়।
- আরোহী পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সাধারণ সিদ্ধান্তকে সবসময় চুড়ান্ত বলে ধরে নেয়া যায় না। তবে সেগুলো সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- শুরুতে বাস্তব উদাহরণ দেয়া হয় বলে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে।
- শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষার্থীরা গাণিতিক সূত্র বা কোনো সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত থাকে।
- পদ্ধতিটি দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ও ক্লান্তিজনক।
- এই পদ্ধতিতে সূত্র গঠন করলেই বিষয়টির পাঠ শেষ হয় না। সমস্যা সমাধানে তা প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণাকে সুস্পষ্ট করতে হয়।
- আরোহী পদ্ধতিতে সূত্র গঠিত হয় এবং গাণিতিক আরোহের মাধ্যমে সূত্রের সত্যতা যাচাই করা হয়

অবরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- অবরোহী পদ্ধতি ঠিক আরোহী পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি।
- অবরোহী পদ্ধতিতে সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়া যায়।
- অবরোহী পদ্ধতির সত্যগুলো আরোহী পদ্ধতিতে নিরূপিত হয়।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে পারে।
- অবরোহী পদ্ধতি যুক্তিসম্মত ও সংক্ষিপ্ত।
- শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি উন্নয়নে সহায়ক।
- অবরোহী প্রমাণের প্রথম ধাপে বিমূর্ত সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করা হয় বলে শিক্ষার্থীর জন্য তা বুঝা কঠিন হয়।
- সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখনে অংশগ্রহণ করতে পারে না।
- শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার তেমন উন্নয়ন ঘটে না।

আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic Method):

আবিষ্কার পদ্ধতি বা Heuristic Method এর উদ্ভাবক হেনরি এডওয়ার্ড আর্মস্ট্রং। আবিষ্কার পদ্ধতি কাকে বলে তা আলোচনার আগে আবিষ্কার কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আবিষ্কার বা Heuristic কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে। শব্দটির অর্থ হলো আমি আবিষ্কার করি (I find out) । এই কথাটির মধ্যেই আবিষ্কার পদ্ধতির অর্থ নিহিত রয়েছে। এখানে শিক্ষার্থী নিজে আবিষ্কার করে বলেই এই পদ্ধতিকে আবিষ্কার পদ্ধতি বলা হয়েছে।

আবিষ্কার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীকে কোনো কিছু বলে দেওয়া হবে না, সে নিজে তার প্রস্তুতি ও আগ্রহ অনুযায়ী সমস্যা নির্বাচন করবে ও তার সমাধান করবে। তাই বলে শিক্ষকও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবেন না। তিনি শ্রেণিকক্ষে এমন একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে উৎসাহিত হতে এবং উপযুক্ত নিয়ম ও সূত্র ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে পারে। এক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ বলতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের বন্ধুসুলভ ব্যবহার থেকে শুরু করে, বইপত্র ও উপকরণ ইত্যাদি গণিত শিক্ষায় প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করাকে বুঝায়। আবিষ্কার পদ্ধতি পৃথক কোন শিখন-শেখানো পদ্ধতি নয়, বরং এটি একটি বাস্তবমুখী কৌশল এবং এই কৌশল সব পদ্ধতির মাঝেই থাকতে পারে। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেরা আবিষ্কার করে বলেই এই পদ্ধতিকে আবিষ্কার পদ্ধতি বলা হয়।

উদাহরণ: "মিনা, আলীর মেয়ে। তাদের বয়স একত্রে ৪৫ বছর। আলীর বয়স মিনার বয়সের ৬ গুণের চেয়ে ৩ বছরের বেশি। আলী ও মিনার বয়স কত?" সমস্যাটি সমাধানের জন্য আবিষ্কার পদ্ধতির তিনটি কৌশল নিম্নে বর্ণিত হলো:

কৌশল-১: চিত্র অংকন

এখানে চিত্রে সম্ভাব্য সমাধানটির দৃশ্যরূপ দেখানো হলো। তাদের বয়সের সমষ্টি ৪৫ বছর। আলী সাহেবের বয়স মিনার বয়সের ৬ গুণের চেয়ে ৩ বছর বেশি। নিচের চিত্রে ব্যাপারটি প্রকাশ করা হয়েছে।

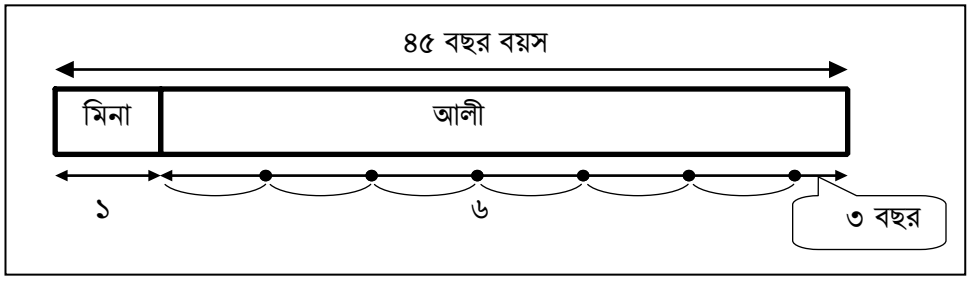

মিনার বয়সের ৭ গুণ = ৪৫ বছর - ৩ বছর = ৪২ বছর

এজন্য, মিনার বয়স = ৪২ ÷ ৭ = ৬ বছর এবং আলীর বয়স = ৬ × ৬ + ৩ = ৩৯ বছর
উত্তর: মিনার বয়স ৬ বছর, আলীর বয়স ৩৯ বছর।

উত্তরটি সঠিক হয়েছে কিনা তা যাচাই করি:
মোট বয়স = ৬ + ৩৯ = ৪৫ বছর
আলীর বয়স = ৬ × ৬ + ৩ = ৩৯ বছর

কৌশল-২: নমুনা খুঁজে পাওয়া

এ কৌশলে কিছু ক্ষেত্রে একই ধরনের প্যাটার্ন খুঁজে নিতে হয়। এ জন্য কয়েক বার ভুল-প্রচেষ্টা অনুশীলন করতে হয়। সমস্যাটিতে যদি মিনার বয়স ১ বছর ধরা হয়, তাহলে আলীর বয়স হবে: ১ × ৬ + ৩ = ৯ বছর। একত্রে মোট বয়স হবে ১ + ৯ = ১০ বছর।
নিচের ছকটিতে ৩ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া দেখান হয়েছে।

মিনার বয়স	১	২	৩	৪	৫	৬	---
আলীর বয়স	৯	১৫	২১				
মৌট বয়স	১০	১৭	২৪				

মোট বয়সের সারিটির ১০, ১৭, ২৪ পরেরটি আগেরটি থেকে ৭ বেশি। ৭ করে বৃদ্ধিতে মোট যোগফল ১০, ১৭ এবং ২৪। যখন মিনার ৪, ৫, ৬,--- বছর বয়স হবে তখন মোট যোগফল হবে ৩১, ৩৮, ৪৫,-----হবে। এজন্য, যখন মিনার বয়স ৬ বছর, তখন একত্রে মোট বয়স হবে ৪৫ বছর। তাহলে আলীর বয়স হলো ৩৯ বছর। এটিকে একটি প্যাটার্নও বলা যায়।
উত্তর: মিনার বয়স ৬ বছর এবং আলীর বয়স ৩৯ বছর।

কৌশল-৩: সম্ভাব্য সকল কিছু পরীক্ষা করা

এ পদ্ধতিটি খবুই সাধারণ। সঠিক উত্তর খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সমস্যার সম্ভাব্য সকল মান বসিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এজন্য বার বার ভুল এবং সংশোধন করে প্রতিবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পূর্বোক্ত আবিষ্কার পদ্ধতির ২ নং কৌশলের সমস্যাটি যদি এই প্রক্রিয়ায় সমাধান করতে চাই তাহলে আমরা মিনার বয়স ১ বছর ধরব। অর্থাৎ ১ থেকে শুরু করব, তাহলে নিম্নে বর্ণিত ছক অনুসারে হিসাব নিকাশ করতে হবে।

মিনার বয়স	১	২	৩	৪	৫	৬	---
আলীর বয়স	৯	১৫	২১	২৭	৩৩	৩৯	
মৌট বয়স	১০	১৭	২৪	৩১	৩৮	৪৫	

উপরোক্ত ছক থেকে আমরা একটি উত্তর পাব: মিনার বয়স ৬ বছর এবং আলীর বয়স ৩৯ বছর।
এছাড়া, বিষয়টি বর্ধিতরূপে অনুধাবনের জন্য আমরা যে কোনো সংখ্যা দিয়ে শুরু করতে পারি। আগের উদাহরণে মিনার বয়স ৮ বছর ধরা হয়, তাহলে ৮ সংখ্যা দিয়ে শুরু করতে হবে-
যদি মিনার বয়স ৮ বছর হয়, তাহলে আলীর বয়স = ৮ × ৬ + ৩ = ৫১ বছর
দুই জনের একত্রে বা মোট হয় = ৮ + ৫১ = ৫৯ > ৪৫
এটি সঠিক নয়। মোট বয়স এর থেকে কম। তাই পরের মানগুলো কমাতে হবে।
যদি মিনার বয়স ৭ বছর হয়, তাহলে আলীর বয়স = ৭ × ৬ + ৩ = ৪৫ বছর
দুই জনের মোট হয় = ৭ + ৪৫ = ৫২ > ৪৫, এটিও সঠিক নয়।
মোট বয়স এর থেকে কম। তাই পরের মান আরো কমবে।
যদি মিনার বয়স ৬ বছর হয়, তাহলে আলীর বয়স = ৬ × ৬ + ৩ = ৩৯ বছর
দুই জনের মোট বয়স হয় = ৬ + ৩৯ = ৪৫ এটি সঠিক মান।
অতএব মিনার বয়স ৬ বছর এবং আলীর বয়স ৩৯ বছর।

আবিষ্কার পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে একটি সমস্যা উপস্থাপন করবেন।
- সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষক সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- সমস্যাটি সমাধান করার সময় শিক্ষার্থীদের প্রশ্নসমূহের উত্তর শিক্ষক সরাসরি দিবেন না বরং সৃজনশীল চিন্তার মাধ্যমে তাদেরকে আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনবোধে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিবেন কিন্তু সমাধানটি বলবেন না।
- শিক্ষার্থীরা সমস্যাটি সমাধানের পথ থেকে সরে না যায় শিক্ষক তা খেয়াল রাখবেন।
- সমস্যাটি সমাধানের উপায় এবং সমাধান উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করবেন।

আবিষ্কার পদ্ধতির সুবিধা

- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী এবং সক্রিয় থাকে। ফলে শিক্ষক সহজে পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কারণে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
- নিজ থেকে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীদের আবিষ্কারের মনোভাবের উন্নয়ন ঘটে।
- শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং যুক্তিবাদী হয়।

আবিষ্কার পদ্ধতির অসুবিধা

- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে এই পদ্ধতি কার্যকর নয়।
- প্রয়োগের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশি সময় এবং বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।
- দুর্বল শিক্ষার্থীদেরকে সর্বদা বেশি সহযোগিতা প্রদানের প্রয়োজন হয় যা শ্রেণিতে শিক্ষকের জন্য কঠিন।
- শিক্ষক সব সময় বেশি সহযোগিতা প্রদান করলে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে না এবং শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
- এই পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগের জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট দক্ষতাসম্পন্ন হতে হয়।

সমস্যা সমাধান, প্রকল্পভিত্তিক ও অনুসন্ধানভিত্তিক পদ্ধতি

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Solving Method)

গণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে গাণিতিক ধারণা এবং প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন গণিত শিখনের অন্যতম লক্ষ্য। তাই গণিত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমধান পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন মনিষী সমস্যা সমাধান পদ্ধতিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। জন ডিউই এর মতে, শিক্ষা ব্যক্তির সে সকল গুণের বিকাশ সাধন করবে, যা দ্বারা ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন করতে পারবে এবং সমাজ জীবনের দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করতে সক্ষম হবে। তার মতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে সমস্যা নির্বাচন করলে যখনই সে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে তখনই বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করবে। এই সমাধানের জন্য সে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তা ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করবে। এ ভাবে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে। জন ডিউই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পঞ্চস্তর (UPTCE) কাঠামোর কথা বলেছেন।

এ পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পঞ্চস্তর (UPTCE) কাঠামোটি নিম্নরূপ:

(১) উপলব্ধি (Understand): কী দেওয়া আছে? কী বের করতে হবে?

(২) পরিকল্পনা (Planning): কী করতে পারি? কিভাবে করতে পারি?

(৩) প্রচেষ্টা (Trying): পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করি।

(৪) যাচাই (Check): আমি কি সঠিক উত্তর পেয়েছি? উত্তরটি কি অর্থবহ হয়েছে?

(৫) সম্প্রসারণ (Extend): আমি কী শিখলাম? বিকল্প কোন উপায় আছে কি?

যেকোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধানে জন ডিউই-এর এই পঞ্চস্তর অনুসরণ করা যায়। তবে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে গণিতবিদ জর্জ পোলিয়া-এর চার স্তর অনেক জনপ্রিয়।

জর্জ পোলিয়ার চার স্তর

শিক্ষার্থীদের গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভুত বিখ্যাত মার্কিন **গণিতবিদ জর্জ পোলিয়া** একটি চার-স্তরের মডেল প্রস্তাব করেন। এটি সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীকে ভাবতে, বিশ্লেষণ করতে ও যৌক্তিকভাবে এগোতে সাহায্য করে। নিচে একটি উদাহরণের মাধ্যমে জর্জ পোলিয়ার চার স্তর ব্যাখা করা হলো-

সমস্যা: মীনা এবং রিনার একত্রে ৭৫৩২ টাকা আছে। রিনার চেয়ে মীনার ৫৬০ টাকা বেশি আছে। মীনা এবং রিনা প্রত্যেকের কত টাকা আছে?

১ম স্তর: সমস্যা বুঝতে পারা

সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ হলো সমস্যাটিকে গভীরভাবে বোঝা। এজন্য সমস্যাটি পড়ে বা শুনে কী শর্ত দেয়া হয়েছে এবং কী খুঁজে পেতে হবে তা স্পষ্ট করতে হয়। যেমন, উপরের সমস্যাটির ক্ষেত্রে-

কী শর্ত দেয়া আছে?

- ✓ মীনা এবং রিনার একত্রে ৭৫৩২ টাকা আছে
- ✓ রিনার চেয়ে মীনার ৫৬০ টাকা বেশি আছে

কী খুঁজে বের করতে হবে?

- ✓ মীনা এবং রিনা প্রত্যেকের কত টাকা আছে?

২য় স্তর: পরিকল্পনা প্রণয়ন করা

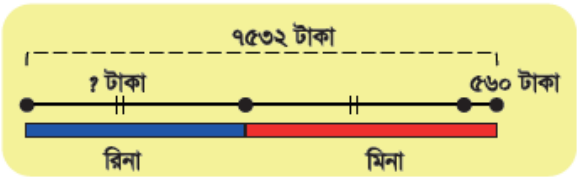

সমস্যা বুঝতে পারার পরের কাজটি হলো কোন প্রক্রিয়ার সমাধান করা যায় তা চিন্তা করা। প্রদত্ত শর্তগুলো কীভাবে ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত সমাধানে উপনীত হওয়া যাবে তার পরিকল্পনা করা। যেমন উপরের সমস্যাটির ক্ষেত্রে-পাশের চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি, দুইজনের মোট ৭৫৩২ টাকা হতে মীনার ৫৬০ টাকা বাদ দিয়ে যে টাকা থাকবে তাকে ২ দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যাবে তা হলো রিনার টাকা। এবার রিনার টাকার সাথে মীনার বেশি টাকা যোগ করলে মীনার প্রকৃত টাকা পাওয়া যাবে।

৩য় স্তর: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা

এই স্তরে পরিকল্পনাটি বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনাটি সঠিক কিনা তা নিশ্চিত নয়। পরিকল্পনা সঠিক কিনা তা না জানা সত্ত্বেও উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে যেতে হয়। যেমন,

রিনার আছে (৭৫৩২-৫৬০) টাকার অর্ধেক টাকা

অর্থাৎ, রিনার আছে = (৭৫৩২-৫৬০) ÷ ২ = ৬৯৭২ ÷২ = ৩৪৮৬ টাকা

অতএব, মীনার আছে =৩৪৮৬ টাকা + ৫৬০ টাকা = ৪০৪৬ টাকা

৪র্থ স্তর: সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা/যাচাই করা

এই স্তরের কাজ হলো সমাধানের প্রক্রিয়া এবং এর হিসাব-নিকাশ ঠিক আছে কিনা, প্রশ্ন অনুসারে উত্তর যথাযথ হয়েছে কিনা, এর কোনো বিকল্প সমাধান আছে কিনা ইত্যাদি যাচাই করা। যেমন, এই সমস্যাটির প্রাপ্ত সমাধান থেকে-

৩৪৮৬ (রিনার টাকা) + ৪০৪৬ (মিনার টাকা) = ৭৫৩২ টাকা (একত্রে), যা সঠিক।

প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method)

জ্ঞান ও শিক্ষালাভের জন্য দুটি উপাদান - একটি সমস্যা (Problem) ও অপরটি সক্রিয়তা (Activity)। আর এই দুই উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method)। গণিত শিক্ষায় প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method) হলো এমন এক শিখন-শেখানো পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘমেয়াদি, অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রকল্প সম্পাদন করে। এতে গণিতের ধারণা, নিয়ম ও দক্ষতাগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গভীরভাবে শেখা যায়।

প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগে চারটি স্তর অনুসরণ করতে হয়।

১.উদ্দেশ্য (Purpose): এক বা একাধিক উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প নির্ধারণ করা হয়। এই স্তরে শিক্ষকের সহযোগিতায় প্রথমেই শিক্ষার্থীরা একটি কাজ বা প্রকল্প স্থির করে। কাজটি করলে তাদের কী উদ্দেশ্য অর্জন হবে তাও নির্ধারণ করে।

২.পরিকল্পনা (Planning): এ স্তরে শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা একটি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক কার্যক্রম এই স্তরে নির্ধারণ করা হয়।

৩.কার্যসম্পাদন (Execution): এ স্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে। শিক্ষক পাশে থেকে প্রয়োজনে সহযোগিতা করেন। কার্য সম্পাদন স্তরই প্রকৃতপক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন স্তর।

৪.মূল্যায়ন (Evaluation): এ স্তরে যে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল তা অর্জিত হয়েছে কিনা, তা মূল্যায়ন করা হয়। কার্যসম্পাদন করার সময় উদ্দেশ্য অর্জনে কী কী অসুবিধা হলো তা এই স্তরে জানা যায়।

গণিতে প্রকল্প পদ্ধতির উদাহরণ:

- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের উচ্চতা ও ওজন মাপা এবং সারণী ও স্তম্ভলেখ তৈরি করা।
- বিদ্যালয়ের মাঠের পরিমাপ করে বাগান তৈরির জন্য জ্যামিতিক নকশা তৈরি করা ।
- পরিবারের মাসিক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের হিসাব তৈরি করা।

প্রকল্প-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে জীবন-ঘনিষ্ঠ সমস্যা নিজের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যবহার করে সম্পন্ন করে। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রদ্ধাবোধ, দলের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

অধ্যায় ৫
সংখ্যা ও স্থানীয়মান

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে সংখ্যার ব্যবহার রয়েছে। বাজারে কেনাকাটা, সময় জানা, বয়স বলা কিংবা দূরত্ব মাপা, সকল ক্ষেত্রেই সংখ্যার ব্যবহার অপরিহার্য। সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে, আর সেই স্থানের উপর নির্ভর করে তার মান পরিবর্তিত হয়। একক, দশক, শতক, সহস্র ইত্যাদি স্থানগুলোর মধ্যে অঙ্কের মান ভিন্ন হয়। যেমন সংখ্যা ৩২৫-এ '৫' মানে পাঁচ একক, '২' মানে দুই দশক বা বিশ, আর '৩' মানে তিন শতক বা তিনশত। এই অঙ্কগুলোর মান নির্ধারণের নিয়মকেই বলা হয় স্থানীয়মান। স্থানীয়মান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে শিক্ষার্থীরা সংখ্যা সঠিকভাবে পড়তে, লিখতে এবং তুলনা করতে পারে।

তাই গণিত শেখার প্রাথমিক ধাপেই শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ও স্থানীয়মান সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য এই ধারণাগুলো স্পষ্টভাবে জানা ও শিক্ষার্থীদের কাছে তা সহজভাবে উপস্থাপন করার দক্ষতা থাকা অপরিহার্য। এ সকল গুরুত্ব বিবেচনায় এই অধ্যায়ে সংখ্যা ও অঙ্কের ধারণা, সংখ্যার প্রকারভেদ, স্থানীয়মানের ধারণা ও স্থানীয়মান নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন উপকরণ, কৌশল ও শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে এসব বিষয় কীভাবে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সংখ্যা ও অঙ্ক

সংখ্যা হচ্ছে একটি বস্তু নিরপেক্ষ ধারণা। দৃশ্যমান সবকিছুরই পরিমাণ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন, বস্তুর পরিমাণ বুঝাবার জন্য আমরা সাধারত সাতটি বই, সাতটি পেন্সিল, সাতটি কলম এভাবে বলে থাকি। এখানে সবগুলো জিনিসেরই পরিমাণ হচ্ছে সাত। এখানে '৭' দ্বারা বস্তুর পরিমাণকে প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ '৭' হলো একটি সংখ্যা। এভাবে এক হাতে ৫টি আঙুল, এক মাসে ৩০ দিন, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ২৫০ কিমি ইত্যাদি বাক্যে ৫, ৩০ এবং ২৫০ দ্বারা আঙ্গুল, দিন এবং দূরত্বের পরিমাণ বোঝানো হয়েছে। তাই ৫, ৩০ ও ২৫০ প্রত্যেকেই এক একটি সংখ্যা। সংখ্যা হলো গণিতের প্রাণ। সংখ্যার পরিমাণ অসীম।

বস্তু নিরপেক্ষ সংখ্যা লিখে প্রকাশের জন্য কিছু চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এই প্রতীকগুলোকে অঙ্ক বা সংখ্যা প্রতীক বলা হয়। আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি তাতে ১০টি সংখ্যা প্রতীক বা অঙ্ক রয়েছে। যেমন, আমাদের দেশে ব্যবহৃত সংখ্যা প্রতীক বা অঙ্কগুলো হলো ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯। একটি সংখ্যা প্রকাশের জন্য এক বা একাধিক সংখ্যা প্রতীক বা অঙ্ক ব্যবহার করা হয়।

মানসংখ্যা (Cardinal number) ও ক্রমসংখ্যা (Ordinal Number)

মানসংখ্যা হলো পরিমাণ প্রকাশক। ১, ২, ৩, ৪, ৫ -এগুলো দ্বারা বস্তুর মান বা পরিমাণ প্রকাশ করে।

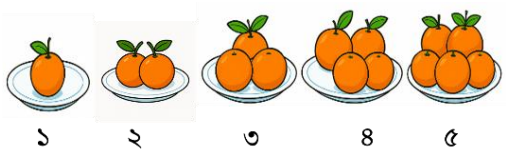

ক্রমসংখ্যা কোনো কিছুর অবস্থান বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন, দৌড়ে কে প্রথম হয়েছে? তোমার কততম জন্মদিন আজ? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তাকে ক্রমসংখ্যা বলা হয়। ক্রমসংখ্যার ক্ষেত্রে কোন দিক থেকে গণনা শুরু হচ্ছে তার উপর ব্যক্তি/বস্তুর অবস্থান বা ক্রম নির্ধারণ হয়। যেমন,

উদাহরণ: পাশের চিত্রে যেকোনো একটি বাক্সের মধ্যে ১টি আপেল আছে। রাজু এক এক করে খোলার পর তা দেখতে পেল।

৪টি খোলা বাক্স, ২টি বন্ধ বাক্স ও ১টি আপেল রয়েছে। অর্থাৎ এখানে ৪, ২, ১ হলো মানসংখ্যা । বাম দিক থেকে চতুর্থ বাক্সে আপেল আছে। ডান দিক থেকে তৃতীয় বাক্সে আপেল আছে। ক্রমসংখ্যা চতুর্থ এবং তৃতীয়।

সংখ্যার প্রকারভেদ

আমরা পূর্বেই জেনেছি গণিতের সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর মধ্যে 'সংখ্যা' একটি প্রধান বিষয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে গণনা, পরিমাপ, হিসাব-নিকাশ, সময় নির্ণয়, দাম জানা সব জায়গাতেই সংখ্যা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু সব সংখ্যা একই ধরনের নয়, সংখ্যাকে তাদের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার ও গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন: বাস্তব সংখ্যা, স্বাভাবিক সংখ্যা, পূর্ণ সংখ্যা, মূলদ সংখ্যা, অমূলদ সংখ্যা, জোড় ও বিজোড় সংখ্যা, মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা ইত্যাদি। সংখ্যার এই প্রকারভেদ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে গণনা, সমাধান, সমস্যা বিশ্লেষণসহ গণিতের অন্যান্য অংশ শেখা অনেক সহজ হয়ে যায়। নিচে সংখ্যার প্রকারভেদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

বাস্তব সংখ্যা: শূন্যসহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে বাস্তব সংখ্যার সেট গঠিত। ছোট থেকে বড় সংখ্যার বিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে আসে ঋণাত্মক সংখ্যা। বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি প্রক্রিয়া থেকে আসে অমূলদ সংখ্যা। অর্থাৎ সব মূলদ ও অমূলদ সংখ্যাকে একত্রে বলা হয় বাস্তব সংখ্যা।

বাস্তব সংখ্যার শ্রেণিবিভাগ: বাস্তব সংখ্যাকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. স্বাভাবিক সংখ্যা: শূন্য অপেক্ষা বড় যে কোন পূর্ণ সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে। যেমন: ২, ৩, ৫.....। এগুলো গণনাকারী সংখ্যা হিসেবেও পরিচিত। গণনা থেকেই প্রথম স্বাভাবিক সংখ্যা আবিষ্কার করা হয়।

২. পূর্ণ সংখ্যা: ভগ্নাংশহীন সংখ্যাই হলো পূর্ণ সংখ্যা। শূন্যসহ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক অসীম সংখ্যার সেটের প্রতিটি সদস্যই একটি পূর্ণ সংখ্যা।

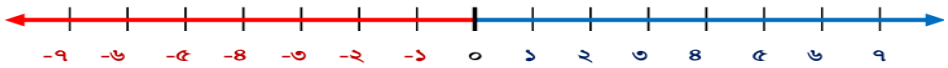

যেমন: -২, ০, ৩ ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা। পূর্ণ সংখ্যা সংখ্যারেখায় দেখানো হলো।

পূর্ণসংখ্যাকে চারভাগে ভাগ করা যায়-

(ক) জোড় সংখ্যা: যেসব সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করলে কোন ভাগশেষ থাকে না, তাদের জোড় সংখ্যা বলে। শূন্যকেও জোড় সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোন সংখ্যার শেষে ২, ৪, ৬, ৮ বা ০ থাকলে সেগুলো জোড় সংখ্যা বা জোড় সংখ্যার প্যাটার্ন। যেমন: -৪, -২, ০, ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪..... এর প্রত্যেকটি জোড় সংখ্যা।

(খ) বিজোড় সংখ্যা: যেসব সংখ্যা পূর্ণসংখ্যা ২ দিয়ে বিভাজ্য নয় তাদের বিজোড় সংখ্যা বলে। কোন সংখ্যার শেষে ১, ৩, ৫, ৭ বা ৯ থাকলে সেগুলো বিজোড় সংখ্যা বা বিজোড় সংখ্যার প্যাটার্ন। যেমন: -৩, -১, ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১.... এর প্রত্যেকটি বিজোড় সংখ্যা।

(গ) মৌলিক সংখ্যা: যে সংখ্যাগুলো কেবল ১ ও সেই সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য, তাদের মৌলিক সংখ্যা বলে। যেমন: ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭ ইত্যাদি।

(ঘ) যৌগিক সংখ্যা: মৌলিক সংখ্যা নয় এমন সকল সংখ্যাকে যৌগিক সংখ্যা বলা হয়। যৌগিক সংখ্যার ২-এর অধিক গুণনীয়ক থাকে। যেমন: ৪, ৬, ৮, ৯, ১৫ ইত্যাদি।

৩. মূলদ সংখ্যা: নিচের উদাহরণটি ভালোভাবে লক্ষ্য করি এবং মূলদ সংখ্যার ধারণা লাভ করার চেষ্টা করি।

ধরা যাক, একটি পাত্রে ৩ গ্লাস পানি ধরে। ১ গ্লাস পানি দ্বারা পাত্রের কত অংশ পূর্ণ হয়?

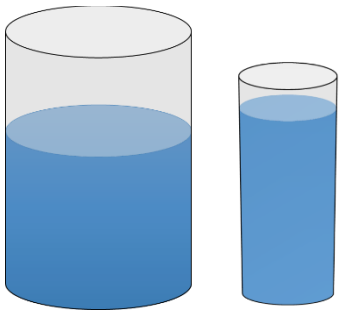

এ প্রশ্নের উত্তর হলো; $\frac{১}{৩}$, এটি একটি মূলদ সংখ্যা।

যেসব সংখ্যা পূর্ণসংখ্যায় প্রকাশ করা যায় না তা ভগ্নাংশ রূপে প্রকাশ করা যায়। সংখ্যাকে ভগ্নাংশে রূপ দেয়া সংখ্যাই হলো মূলদ সংখ্যা। অর্থাৎ যে সংখ্যাকে দুটি পূর্ণ সংখ্যার ভাগফল আকারে প্রকাশ করা যায় তাকে মূলদ সংখ্যা বলে। যেমন: $\frac{২}{৩}, \frac{৫}{৬}$ ইত্যাদি।

মূলদ সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত। দুইটি মূলদ সংখ্যার মাঝে অসংখ্য মূলদ সংখ্যা থাকে। মূলদ সংখ্যার বিস্তৃতি অসীম।

৪. অমূলদ সংখ্যা: যে সংখ্যাকে দুটি পূর্ণ সংখ্যার ভাগফল আকারে প্রকাশ করা যায় না, তাকে অমূলদ সংখ্যা বলে। যেমন যেমন, $\sqrt{২}$= ১.৪১৪২১৩৫৬..... ।

নিচের চিত্রে আমরা বাস্তব সংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস দেখতে পাই।

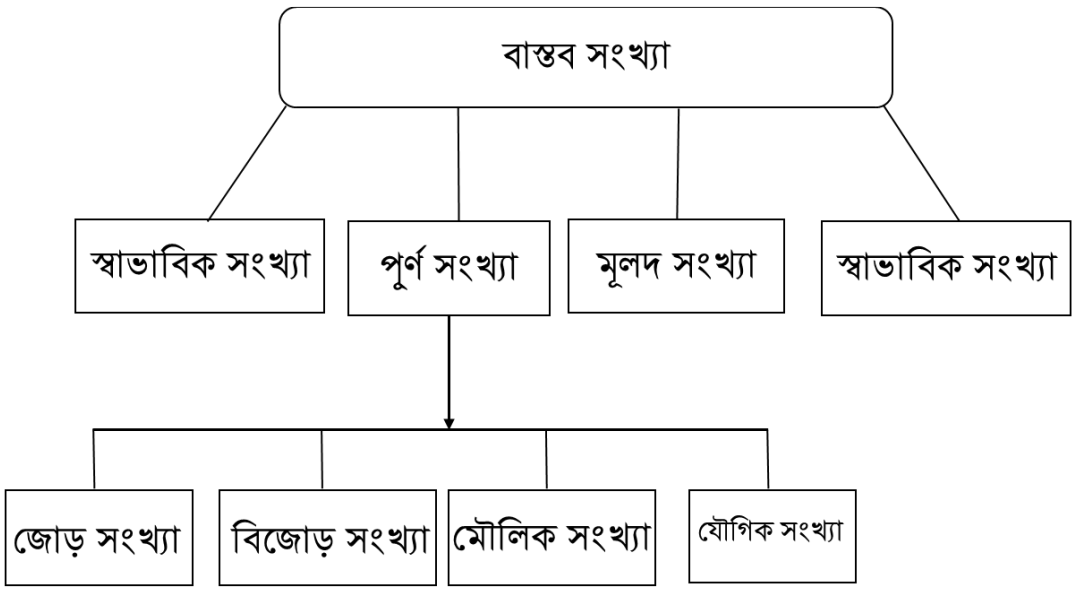

২. নিচের সংখ্যাগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করি এবং নিচের টেবিলটি পূরণ করি।

০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২১, ২৫, √৩, √৯, $\frac{১}{২}$, $\frac{৩}{৪}$, $\frac{৫}{৩}$

প্রতিটি সংখ্যার পাশে যেসব শ্রেণি প্রযোজ্য সেখানে (✓) চিহ্ন দিই।

সংখ্যা	স্বাভাবিক	পূর্ণ	জোড়	বিজোড়	মৌলিক	যৌগিক	মূলদ	অমূলদ
০								
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								
৮								
৯								
১০								
১১								
১২								
১৩								
১৪								
১৫								
১৬								
১৮								
২১								
২৫								
√৩								
√৯								
$\frac{১}{২}$								
$\frac{৩}{৪}$								
$\frac{৫}{৩}$								

স্থানীয়মান

সংখ্যার ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় আদিযুগের মানুষও সংখ্যার স্থানীয়মানের পরিবর্তনের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করত। স্থানীয়মান আলোচনার পূর্বে সংখ্যার ভিত্তি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। অনেক জিনিস গণনায় 'হালি' কথাটি ব্যবহার করা হয়। এখানে এক হালি পূর্ণ হলে এক হালি এক, এক হালি দুই, এক হালি তিন ইত্যাদি বলা হয়। এ নিয়মে সংখ্যার পরিবর্তনের ভিত্তি হচ্ছে চার। এমনিভাবে যখন 'ডজন'ব্যবহার করা হয় তখন এক, দুই করে ১২টি হলে

বলা হয় এক ডজন, পরবর্তী সংখ্যাকে বলা হয় ১ ডজন ১টি, ১ ডজন ২টি ইত্যাদি। এখানে সংখ্যার ব্যবহারকে ১২ ভিত্তিক বলা যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যে কোন সংখ্যা গণনায় কোন একটি সংখ্যাকে কেন্দ্র করে সংখ্যার স্থানীয় মানের পরিবর্তন করা হয়। সংখ্যা গণনায় যে সংখ্যাকে কেন্দ্র করে কোন সংখ্যার স্থানীয় মান পরিবর্তন করা হয় তাই হচ্ছে সংখ্যা ভিত্তি। বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মানের পরিবর্তনের ভিত্তি হচ্ছে ১০। তাই এ পদ্ধতিকে দশ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

প্রাথমিক গণিত (১ম শ্রেণি) বইয়ের স্থানীয় মানের ধারণা প্রদানের চিত্র দুইটি লক্ষ্য করি।

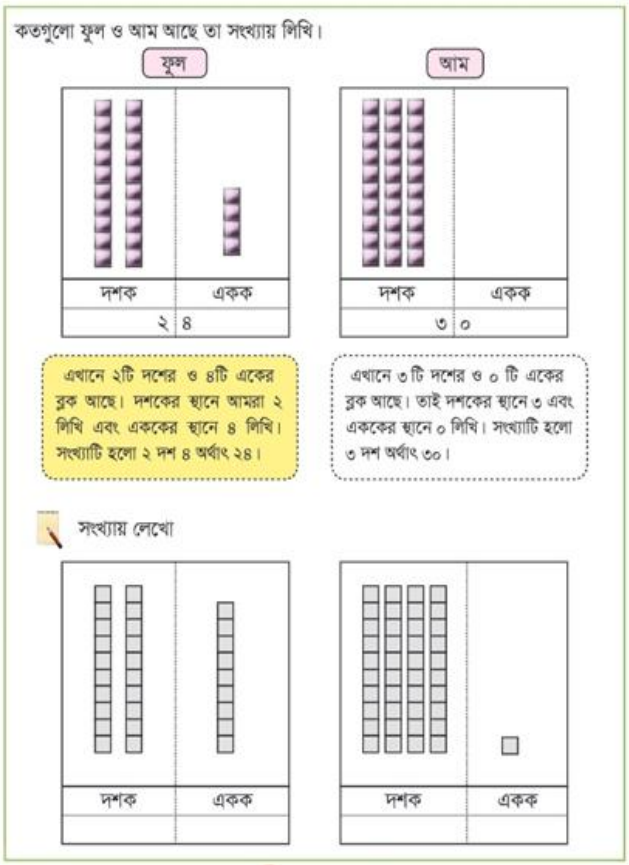

উপরের চিত্রে ফুলের সংখ্যা গণনা করে যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তা হলো ২৪। অর্থ্যাৎ ২ দশক ও ৪ একক। এখানে সংখ্যাটির ডানের ৪ এর মান ৪ একক বা ৪ এবং বামের ২ এর মান ২ দশক বা ২০। এখানে লক্ষণীয় ডান থেকে প্রতিঘর বামের জন্য মান ১০ গুণ করে বৃদ্ধি পায়। তাই সংখ্যাটির ডান থেকে বাম দিকে অঙ্কের বিভিন্ন অবস্থানকে যথাক্রমে একক ও দশক বলে। অর্থ্যাৎ অঙ্ক, সংখ্যার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের কারনে যে মান অর্জন করে তাকে ঐ অঙ্কের স্থানীয়মান বলে। অপরদিকে কোন অঙ্ক সংখ্যার একক স্থানে যে মানে থাকে তাকে ঐ অঙ্কের স্বকীয়মান বলে। যেমন নিচের উদাহরণটিতে ৭ এর স্বকীয়মান ৭ এবং স্থানীয়মান ৭।

উদাহরণ: ৪ ৯ ০ ৩ ৭ সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান বের করি।

অযুত	হাজার	শতক	দশক	একক
৪	৯	০	৩	৭

৭ একক ৭
৩ দশক ৩০
০ শতক ০
৯ হাজার ৯০০০
৪ অযুত ৪০০০০

সংখ্যা ও স্থানীয়মান শিখন-শেখানো কৌশল

১. প্রাক-সংখ্যার ধারণা: যত-তত, কম-বেশি, বড়-ছোট

শিশুদের সংখ্যা ধারণা গঠনে 'যত-তত', 'কম-বেশি' এবং 'বড়-ছোট' ধারণাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এগুলোকে সংখ্যা শেখার আগের ভিত্তি বা প্রাক-সংখ্যা ধারণা বলা হয়। শিশুরা যখন ২টি মার্বেল, ২টি কাঠি, ২টি বীচি বা ২টি পাথর একসাথে দেখতে পায়, তখন তারা বুঝতে পারে যে, সব জায়গায় জিনিসের সংখ্যা সমান। এই সমান সংখ্যার দল দেখার মাধ্যমে তাদের '২' সংখ্যাটি সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়। অর্থাৎ, 'যত-তত' ধারণা শিশুদের সংখ্যা বোঝার শুরুতে বড় ভূমিকা রাখে।

একইভাবে, যদি ২টি মার্বেল ও ৩টি মার্বেল আলাদা রাখা হয়, শিশু সহজেই দেখতে পায় যে ৩টি মার্বেল ২টির চেয়ে বেশি এবং ২টি মার্বেল ৩টির চেয়ে কম। এভাবেই 'কম-বেশি' ধারণা শিশুদের ২ ও ৩ সংখ্যার পার্থক্য বোঝায়। ঠিক তেমনি বড় ও ছোটের ধারণাও সংখ্যার ভিন্নতা বুঝতে সাহায্য করে।

তাই সংখ্যা শেখানোর শুরুতে বিভিন্ন উপকরণ বা ছবি, চার্ট ব্যবহার করে 'যত-তত', 'কম-বেশি' এবং 'বড়-ছোট' ধারণা শিশুদের দেওয়া খুব জরুরি। কারণ এগুলো সংখ্যা শেখার আগের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বজ্ঞান।

ধারনা গঠন: যত-তত

যত বল

কয়টি বল-তিনটি

তত ফুল

কয়টি ফুল-তিনটি

ধারনা গঠন: কম-বেশি

আম কম

কয়টি আম-তিনটি

কাঁঠাল বেশি

কয়টি কাঁঠাল-চারটি

এভাবে আরও উদাহরণের মাধ্যমে 'কম-বেশি', 'বড়-ছোট' ধারণা শেখাতে হবে। সংখ্যা প্রতীক ও সংখ্যা শিখনের পর সংখ্যার 'বড়-ছোট' শেখাতে হবে।

২. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা শিখন-শেখানো কৌশল

১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা শেখানো শিশুদের গণিতের ভিত্তি গঠনের প্রথম ধাপ। এই ধাপে শিশু যেন চোখে দেখে, হাতে ধরে, গণনা করে এবং অনুভব করে সংখ্যা শিখতে পারে সেজন্য শিক্ষকের বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন। নিচে প্রাথমিক গণিতে সংখ্যা শেখানোর কার্যকর তিন পর্যায়ের কৌশল উপস্থাপন করা হলো।

বাস্তব পর্যায়

এ পর্যায়ে শিশু বাস্তব বস্তু ব্যবহার করে সংখ্যা শেখে। এক্ষেত্রে গণনাবস্তু যেমন: তেঁতুলবীচি, লিচুবীচি, খেলনা, বই, পেন্সিল, শ্রেণিকক্ষের বস্তু (ডেস্ক, চেয়ার, দরজা ইত্যাদি), বোতলের ঢাকনি, পুরাতন ম্যাচবাক্স, বাঁশের কাঠি, কাঠের ব্লক, মার্বেল ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশু বাস্তব বস্তু নাড়াচাড়া করে, ছুঁয়ে দেখে গণনা করবে। যেমন ১টি মার্বেল, ২টি কাঠি, ৩টি বীচি, ৪টি বোতাম এভাবে ১০ পর্যন্ত। শিশুর চারপাশের পরিচিত জিনিস দিয়ে সংখ্যা ধারণা স্বাভাবিকভাবে তৈরি করা যায়। যেমন: তোমার কয়টি বই? তোমার দুই হাতে মোট কয়টি আঙুল? শ্রেণিতে কয়জন ছেলে? কয়টি জানালা আছে? শিশুকে চিনতে, দেখতে, গণনা করতে উৎসাহিত করা হলো মূল উদ্দেশ্য।

অর্ধবাস্তব পর্যায়

শিশুর পরিচিত জিনিসপত্রের ছবির মাধ্যমে সংখ্যার ধারণা এবং সংখ্যা পঠন ও লিখন শিক্ষাদান করা যেতে পারে। যেখানে বাস্তব জিনিসের জায়গায় ছবি, চার্ট, কার্ড ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ৩ সেট কার্ড তৈরি করা যায়। সংখ্যা কার্ড (১–১০) ছবির কার্ড (১টি ছবি, ২টি ছবি...১০টি ছবি) সংখ্যা কথায় লেখা কার্ড (এক, দুই...দশ) শিশুরা তিনটি কার্ড মিলিয়ে সাজাবে ৩ = তিন = তিনটি বল, ৭ = সাত = সাতটি ফুল। আবার সংখ্যা প্রদর্শন ও সংখ্যা লেখা শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক কার্ড তুলে বলবেন 'এটি ১, এখানে ১টি ছবি আছে, এখানে 'এক' লেখা আছে।" শিশু আঙুল দিয়ে বাতাসে বা টেবিলে '১' আঁকবে। এভাবে ২ থেকে ১০ পর্যন্ত।

বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়

শিশু বাস্তব বা ছবির সহায়তা ছাড়াই শুধুমাত্র সংখ্যা প্রতীক নিয়ে কাজ করতে শেখে। এ পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত বড় আকারের পোস্টার টানিয়ে সংখ্যা চেনা, নাম বলা এবং সঠিকভাবে সংখ্যা লেখানো অনুশীলন করা যেতে পারে। শিশু সংখ্যা গুলোকে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজাতে শিখে, যেমন: ১, ২, ৩, ৪, ৫ বা ১০, ৯, ৮, ৭..., যা তার সংখ্যাবোধকে দৃঢ় করে। একইভাবে '৬ কি ৪ থেকে বড়?' বা '২ কি ৯ থেকে ছোট?' এ ধরনের তুলনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে বড়-ছোট ধারণা গড়ে ওঠে। এছাড়া ডটেড (dotted) সংখ্যার সাহায্যে শিশু নিজে নিজে সংখ্যা লিখে অনুশীলন করে, ফলে তার লিখন দক্ষতা উন্নত হয়।

প্রাথমিক গণিত ১ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ১৩ নং পৃষ্ঠা লক্ষ্য করি। ছবিটিতে সংখ্যা শেখানোর কৌশল ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে, যেখানে প্রথমে শিশুকে বাস্তব জিনিস যেমন ফল দেখে গণনা করতে দেওয়া হয়, এরপর সেই সংখ্যার সমান রং করা ঘর পূরণ করতে হয় যা *যত-তত* ধারণা তৈরি করে। পরে বড় আকারে লেখা সংখ্যাগুলো দেখে শিশু সংখ্যা চেনা, পড়া ও বলা শিখে, এবং শেষে ডটেড (dotted) সংখ্যার ওপর লিখন অনুশীলনের মাধ্যমে সঠিকভাবে সংখ্যা লেখা শেখে। ফলে বাস্তব বস্তু→চিত্রভিত্তিক উপস্থাপন→প্রতীক চেনা→লিখন অনুশীলন। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় শিশু দেখে, রং করে, পড়ে ও লিখে সংখ্যা সম্পর্কে পূর্ণ ও অর্থবহ ধারণা অর্জন করে।

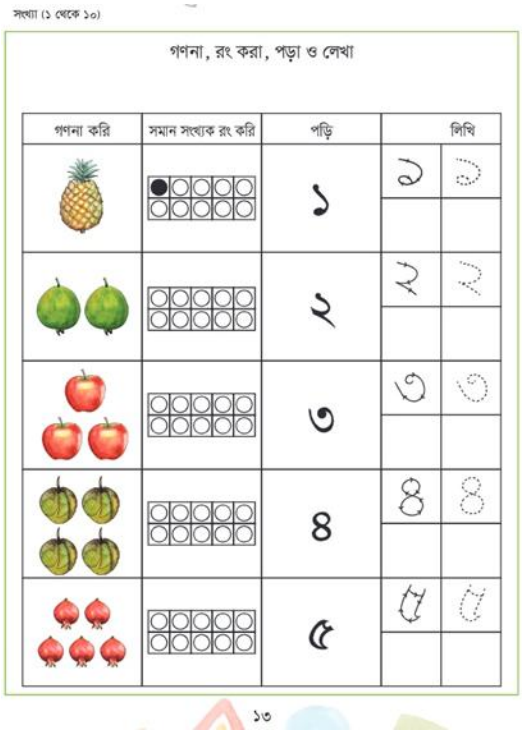

৩. শূন্যের ধারণা

শূন্য মানে হলো কিছু না থাকা। যখন কোনো পাত্রে, ঘরে বা স্থানে যখন একটিও বস্তু থাকে না, তখন সেই সংখ্যাকে শূন্য বলা হয়। শূন্যকে আমরা ০ সংখ্যা দিয়ে লিখি।

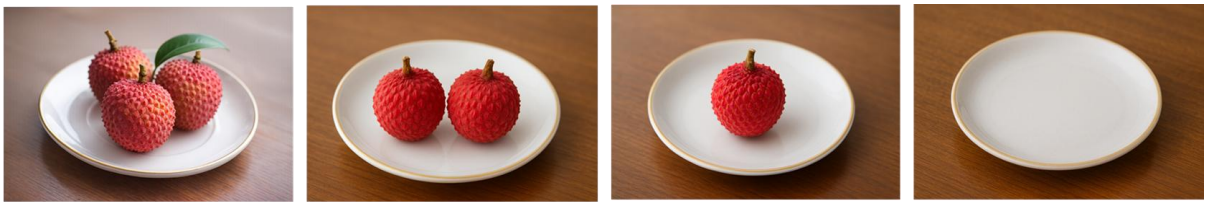

প্রথমে বস্তু গুনে সংখ্যা লেখা হয়। যেমন, কোনো পাত্রে যদি ৩টি লিচু থাকে, আমরা লিখি ৩; ২টি থাকলে ২; ১টি থাকলে ১টি আর একটিও না থাকলে লিখি ০।

শূন্য বোঝাতে প্রাথমিক গণিতে খালি ঘর, খালি বৃত্ত বা খালি বাক্স দেখানো হয়। এগুলো দেখে শিশুরা বুঝতে শেখে যে খালি মানেই শূন্য। এভাবে তারা বস্তু গোনা, সংখ্যা চেনা এবং শেষ পর্যন্ত খালি ঘরের জন্য শূন্য (০) লিখতে শেখে।

৩. স্থানীয়মান ব্যবহার করে ১১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা শিখন-শেখানো কৌশল

৩. স্থানীয়মান ব্যবহার করে ১১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা শিখন-শেখানো কৌশল

এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ কৌশল হলো স্থানীয় মানের ধারণা প্রয়োগ করে সংখ্যা গণনা করা। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, কোন সংখ্যা ০ থেকে ৯ এই দশটি অঙ্ক দিয়ে গঠিত হয়। প্রতিটি অঙ্কের মান শুধু তার সংখ্যাগত মানে নির্ভর করে না, বরং সে কোন স্থানে বসেছে তার ওপরও নির্ভর করে। একই অঙ্ক এককের ঘরে বসলে একক মান, আবার হাজারের ঘরে বসলে হাজারের মান প্রকাশ করে। অঙ্কের এই অবস্থান নির্ভর মানকেই বলা হয় স্থানীয় মান। স্থানীয় মান নির্ণয় শিখন-শেখানো কৌশল বর্ণনা করলেই ১১ থেকে ১০০ বা অসীম পর্যন্ত সংখ্যা গণনা শিখন সহজ হবে।

প্রাথমিক গণিত ২য় শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ২৭ নং পৃষ্ঠায় স্থানীয় মান শিখন পদ্ধতি লক্ষ্য করি। স্থানীয় মান ধারণা গঠনে শিশু ধাপে ধাপে বাস্তব বস্তু থেকে প্রতীকী পর্যায়ে অগ্রসর হয়। প্রথমে কাঠি বা অনুরূপ উপকরণ গণনার মাধ্যমে সংখ্যা সম্পর্কে তার প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা হয়। পরবর্তী ধাপে ১০টি কাঠিকে একত্র করে একটি বান্ডিল বা “দশক” এবং খোলা কাঠিগুলোকে “একক” হিসেবে প্রদর্শন করা হয়, যাতে শিশু বুঝতে শেখে যে এককের দল গঠন করলে তার মান পরিবর্তিত হয়ে দশকে রূপ নেয়। এরপর দশক ও এককের সমন্বয়ে সংখ্যা গঠন যেমন: ১ দশক ও ৪ একক = ১৪ এভাবে স্থানীয় মানের ভিত্তিগত ধারণা পরিষ্কার করা হয়। পরবর্তী ধাপে ব্লক বা কিউব ব্যবহার করে দুই দশক ও তিন একক প্রদর্শনের মাধ্যমে সংখ্যা ২৩ গঠনের প্রক্রিয়া দেখানো হয়, যা দশক ও এককের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝায়। সর্বশেষে শিশু ২ × ১০ = ২০ এবং ৩ × ১ = ৩ হিসাব করে মোট মান ২৩ নির্ণয় করতে শেখে, যা স্থানীয় মান নির্ণয়ের বিমূর্ত বা প্রতীকী স্তরকে সুসংহত করে।

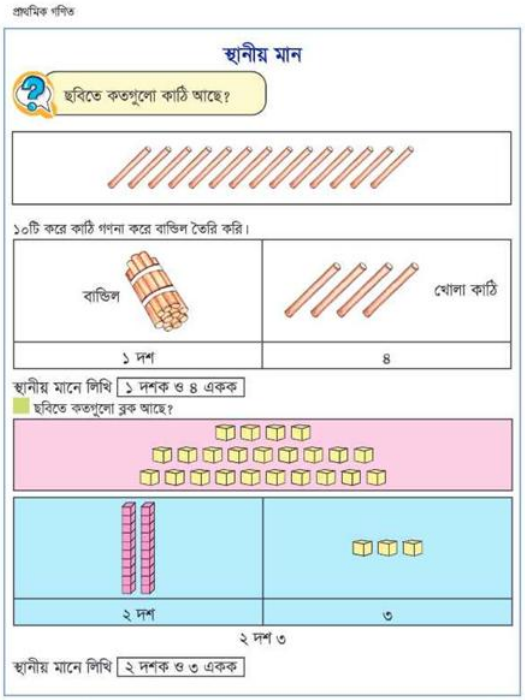

৪. স্থানীয়মান ব্যবহার করে ১০১ থেকে ১০০০ পর্যন্ত সংখ্যা শিখন-শেখানো কৌশল

১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা শিশুদের বাস্তব উপকরণ গুনিয়ে বা সংখ্যা চার্ট ব্যবহার করে শেখানো সহজ হলেও, সংখ্যা যখন ১০০-এর বেশি হয় তখন বস্তু গণনা করা অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। তাই বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে শিশুদের স্থানীয় মান (একক-দশক-শতক-হাজার-অযুত-লক্ষ-নিযুত-কোটি) বোঝানোর কৌশল আয়ত্ত করানো জরুরি। ১০০ থেকে ৯৯৯ পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যায় ডান দিকের প্রথম অঙ্কটি একক, তার বাম পাশের অঙ্কটি দশক এবং তার পরের অঙ্কটি শতক নির্দেশ করে। শিক্ষক এই স্থানের ধারণা শিশুদের পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেবেন এবং কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখাবেন কীভাবে সংখ্যা পড়তে ও লিখতে হয়। যেমন: ২৪৫ সংখ্যায় ২ হলো শতক, ৪ হলো দশক এবং ৫ হলো একক। অর্থাৎ এখানে আছে ২ শতক + ৪ দশক + ৫ একক, যা পড়তে হবে ‘দুই শত পঁয়তাল্লিশ’। এভাবে স্থানভিত্তিক মান ভেঙে দেখালে শিশুরা সহজেই ১০১ থেকে ১০০০ পর্যন্ত সংখ্যার লিখন ও পঠন কৌশল রপ্ত করতে পারে।

৫. আরও বড় সংখ্যার গণনা ও স্থানীয় মান শিখনের জন্য নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করি।

কোটি	নিযুত	লক্ষ	অযুত	হাজার	শতক	দশক	একক
৫	৭	৬	৪	৮	০	৯	৭

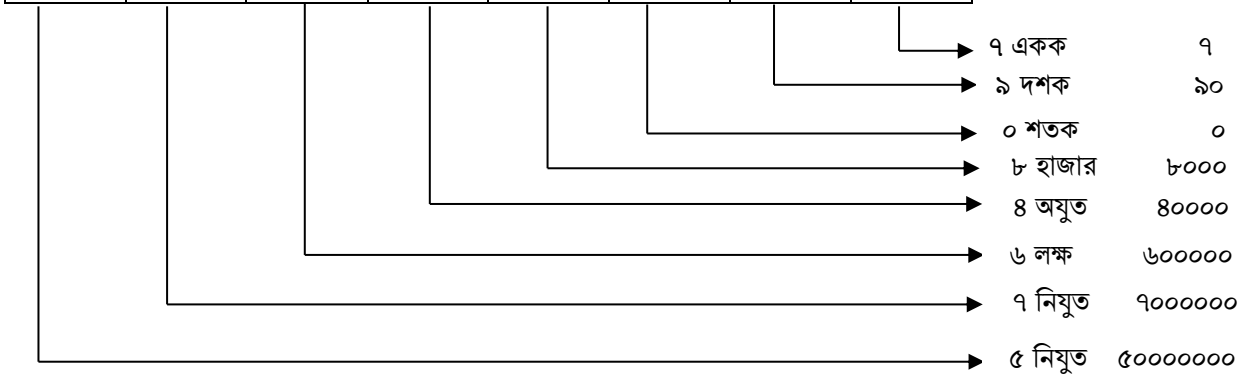

৫৭৬৪৮০৯৭ সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর স্থানীয় মান নির্ণয় শেখানোর জন্য প্রথমে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে হবে ৫৭৬৪৮০৯৭ সংখ্যাটিতে মোট ৮টি অঙ্ক রয়েছে- ৫, ৭, ৬, ৪, ৮, ০, ৯ এবং ৭। অবস্থান ভেদে সর্ব ডানের ৭ অঙ্কটি একক স্থানে আছে, তাই এই ৭ এর মান ৭। ডান থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক ৯ দশকের ঘরে আছে বলে এর মান ৯ দশ বা ৯০। ডান থেকে তৃতীয় অঙ্ক ০ শতকের ঘরে থাকায় এর মান ০ শতক বা ০। চতুর্থ স্থানে থাকা ৮ হাজারের ঘরের অঙ্ক, তাই এর মান ৮ হাজার বা ৮০০০। পঞ্চম স্থানে থাকা ৪ দশ হাজারের (অযুত) ঘরে আছে, তাই এর মান ৪ দশ হাজার বা ৪০,০০০। ষষ্ঠ স্থানে থাকা ৬ লক্ষ স্থানে অবস্থান করছে, তাই এর মান ৬ লক্ষ বা ৬,০০,০০০। সপ্তম স্থানে থাকা ৭ দশ লক্ষ (নিযুত) স্থানে আছে, এর মান ৭ দশ লক্ষ বা ৭০,০০,০০০। আর সর্ব বামের অঙ্ক ৫ কোটি স্থানে আছে, তাই কোটি ঘরের এই ৫-এর স্থানীয় মান ৫ কোটি বা ৫,০০,০০,০০০।

সংখ্যা শিখনে উপকরণের ব্যবহার

১. রঙিন বোতাম/কাঠি/কিউব

সংখ্যা গণনার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন, শিশুকে ৫টি রঙিন বোতাম দিই। বলি: 'একটা, দুইটা, তিনটা...' প্রতিটি সংখ্যা উচ্চারণের সময় একটি করে বস্তু ধরতে বলি।

২. সংখ্যা কার্ড

প্রতিটি কার্ডে একটি করে সংখ্যা থাকে (১-১০০ বা আরও বেশি)। সংখ্যা চিনতে ও সাজাতে সাহায্য করে। যেমন, সংখ্যা কার্ড দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করি: 'এটা কত?' শিশুরা বলা সংখ্যাটি খুঁজে দেখাবে। এছাড়া ১-১০ পর্যন্ত কার্ড এলোমেলো করে দিই। শিশুকে সঠিকভাবে সাজাতে বলি, ইত্যাদি।

৩. সংখ্যা রেখা

সরল রেখায় ০ থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যা বসানো হয়। যোগ-বিয়োগ শেখার জন্য খুব কার্যকর। সংখ্যা রেখা বা বোতাম দিয়ে দেখানো: 'তোমার কাছে ৩টা পেন্সিল আছে, আমি আরও ২টা দিলাম, সবমিলে কত হলো?'

৪. ডাইস ও ঘূর্ণন চাকা

খেলার মাধ্যমে সংখ্যার চর্চা করা যায়। সংখ্যা চেনা ও গণনা শেখার মজার উপায়। একটি ডাইস ঘুরিয়ে ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে বস্তু গুনতে বলা।

৫. বিভিন্ন আকৃতির বস্তু

বিভিন্ন আকৃতির বস্তু ব্যবহার করে শিশুদের সংখ্যা শেখানো খুবই সহজ ও মজার একটি উপায়। বিভিন্ন আকৃতির বা রঙের গোলাকার, বর্গাকার, ত্রিভুজাকার বস্তু বা খেলনা সামনে রেখে শিশুকে আগে রঙ বা আকৃতি অনুযায়ী আলাদা করতে বলা হয়, তারপর প্রতিটি দলে থাকা বস্তু গুনতে বলা হয়। এতে তারা বুঝতে পারে রঙ বা আকৃতি যাই হোক, গোনার নিয়ম একই। এর ফলে সংখ্যা ও পরিমাণ বোঝা সহজ হয় এবং গুনতে পারার অভ্যাস তৈরি হয়। রঙ ও সংখ্যা চিহ্নিত করে গোনার অনুশীলন।

৬.চিত্রসংবলিত সংখ্যা চার্ট

প্রতিটি সংখ্যার পাশে সেই সংখ্যার পরিমাণ অনুযায়ী বস্তু থাকে। প্রতিটি চিত্র একবার করে ছুঁয়ে বলতে শেখায়: '১... ২... ৩...' গোনার মাধ্যমে শিশু সংখ্যা ও পরিমাণ মেলাতে শেখে।

স্থানীয়মান শিখনে উপকরণের ব্যবহার

১. রঙিন স্থানীয়মান কার্ড

একক কার্ড: লাল রঙ; দশক কার্ড: সবুজ রঙ; শতক কার্ড: নীল রঙ

শিশুদের একক, দশক, শতক আলাদা আলাদা কার্ড দেখানো হয়। পরে তিনটি একত্র করে সংখ্যা তৈরি করতে শেখানো হয়, যেমন ৪ (লাল), ২ (সবুজ), ৩ (নীল) ⟶ ৩২৪।

২. রঙিন কাঠি বা স্ট্র

একক: আলাদা রঙের কাঠি; দশক: ১০টি কাঠি রাবার ব্যান্ড দিয়ে একসাথে; শতক: ১০টি দশক গুচ্ছ একত্র করে।

৩. কিউব বা ব্লক

একক কিউব এক রঙে; দশক কিউব একত্রে লম্বা করে আরেক রঙে; শতক কিউব দিয়ে বড় স্কয়ার

৪. সংখ্যা চার্ট

কার্ড বা বস্তু রাখার জন্য আলাদা ঘর একক | দশক | শতক এভাবে শিশুরা কার্ড রেখে বুঝে নিচ্ছে কোন স্থানে কোন মান

৫. সংখ্যা পাজল বা ম্যাগনেটিক সংখ্যা সেট

একক, দশক, শতক অংশ আলাদা খন্ড শিশুরা জোড়া লাগিয়ে পূর্ণ সংখ্যা তৈরি করে

সংখ্যা গণিতের ভিত্তি, আর স্থানীয় মান হলো সংখ্যার প্রকৃত মান বোঝার মূল চাবিকাঠি। শিশু যখন সংখ্যা চিনে, গণনা করে, তুলনা করে এবং ধাপে ধাপে সংখ্যার গঠন বুঝতে শেখে, তখন তার গণিত বোধ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্থানীয় মান শেখানোর মাধ্যমে শিশু উপলব্ধি করে যে প্রতিটি অঙ্কের মান কেবল অঙ্কের নিজের মান নয়, বরং সংখ্যার কোন স্থানে অবস্থান করছে তার ওপরও নির্ভর করে। এককের ঘরে থাকা ৫-এর মান ৫ হলেও, শতকের ঘরে থাকা ৫-এর মান ৫০০ এই পরিবর্তনই সংখ্যার প্রকৃত অর্থ বোঝায়। তাই সংখ্যা শেখানো এবং স্থানীয় মান শেখানো একে অপরের পরিপূরক, যা শিশুদের বড় সংখ্যা পড়া, লেখা, ভাঙা, গঠন করা এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করার সক্ষমতা গড়ে তোলে। সঠিক পদ্ধতিতে সংখ্যা ও স্থানীয় মান শেখানো হলে শিক্ষার্থীদের গণিতের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, পাশাপাশি তাদের যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাও সুদৃঢ় হয়।

অধ্যায় ৬
প্রাথমিক চার নিয়ম

গণিত শিক্ষার সবচেয়ে মৌলিক ভিত্তি হলো **প্রাথমিক চার নিয়ম-যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ**। এই চারটি নিয়মের সুস্পষ্ট ধারণা এবং বাস্তবমুখী প্রয়োগ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সংখ্যাবোধ, যৌক্তিক চিন্তা, সমস্যা সমাধান ক্ষমতা এবং দৈনন্দিন জীবনের হিসাব নিকাশে দক্ষতা গড়ে তোলে। তাই একটি কার্যকর গণিতচর্চার জন্য এসব নিয়ম শেখানোর প্রক্রিয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই অপরিহার্য।

এই অধ্যায়টি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীগণ প্রথমে প্রতিটি নিয়মের মৌলিক ধারণা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে, তারপর জানতে পারে কীভাবে বিভিন্ন বয়স, দক্ষতা ও আগ্রহের শিক্ষার্থীদের উপযোগী শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করা যায়। অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ধারণাকে সহজ, বাস্তব ও শিশু বান্ধব পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা, যাতে শিক্ষার্থীরা শুধু নিয়ম শিখে না, বরং ধারণা বুঝে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারে। প্রথম অংশে **যোগ** এর ধারণা-সমষ্টি, বৃদ্ধি, বস্তু মেলানো এবং বাস্তব পরিস্থিতি ব্যবহার করে যোগ বোঝানো আলোচিত হবে। শিশুদের হাতে-কলমে উপকরণ, সংখ্যা রেখা, চিত্র, গল্প ও খেলাভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে যোগকে অর্থবহ করে তোলার কৌশল তুলে ধরা হবে। পরবর্তী অংশে **বিয়োগ** এর ধারণা-কমানো, সরিয়ে নেওয়া, তুলনা করে পার্থক্য নির্ণয়-ব্যাখ্যা করা হবে। বাস্তব উপকরণ ব্যবহার, চিত্রভিত্তিক ব্যাখ্যা, বাস্তবধর্মী সমস্যার মাধ্যমে বিয়োগ শেখানোর কার্যকর কৌশলও এখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এরপর **গুণ** এর ধারণা তুলে ধরা হবে, যা পুনরাবৃত্ত যোগ, সমান-সমান দলে বিভাজন, গুণ শেখানোর সময় বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তু নিরপেক্ষ-এই তিন পর্যায়ভিত্তিক পদ্ধতির গুরুত্বও তুলে ধরা হবে। একইভাবে **ভাগ** এর ধারণা-সমান অংশে বণ্টন এবং গোষ্ঠীতে সাজানো, বাস্তব উদাহরণ ও কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন, যৌক্তিক চিন্তা এবং সমস্যা সমাধান ক্ষমতা গড়ে তুলতে ভাগের সঠিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যায়ে আরও থাকবে **প্রাথমিক চার নিয়মভিত্তিক সমস্যা সমাধানের কৌশল,** যেখানে ধাপে ধাপে সমাধান, চিত্রায়ন, অনুমান-পরীক্ষা, ভাবনা প্রকাশ, যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং বাস্তব প্রসঙ্গ ব্যবহার করে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হবে।

শেষে **ঐকিক নিয়ম** অর্থাৎ এককের মান জেনে বহু এককের মান নির্ণয়ের কৌশল সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হবে। বাজার করা, দূরত্ব নির্ণয়, কাজ ও সময় সম্পর্ক ইত্যাদি দৈনন্দিন প্রয়োগমূলক সমস্যার মাধ্যমে ঐকিক নিয়ম শেখানোর উপায় এখানে তুলে ধরা হবে। সার্বিকভাবে, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো গণিতের প্রাথমিক চার নিয়ম ও ঐকিক নিয়মের ধারণা সুস্পষ্ট করা এবং শিখন-শেখানোর এমন কৌশল ব্যাখ্যা করা যা শিক্ষার্থীদের সংখ্যাবোধ, যৌক্তিকতা ও সমস্যা সমাধানে দক্ষ করে তুলতে সক্ষম।

যোগ

যোগ হলো দুই বা ততোধিক বস্তুর সংখ্যা বা পরিমাণ একত্র করা অথবা বাড়ানোর মাধ্যমে মোট কত হলো তা নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বস্তু যোগ করা যায় না, যোগ করা হয় বস্তুর সংখ্যা বা পরিমাণ। আবার সংখ্যা একত্র করা যায় না, কিন্তু সংখ্যার পরিমাণ একত্র করা যায়।

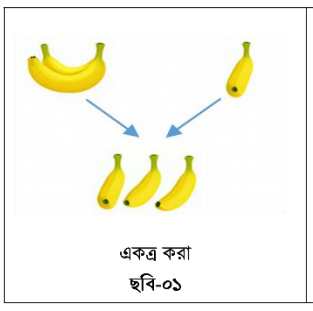

একত্র করা
ছবি-০১

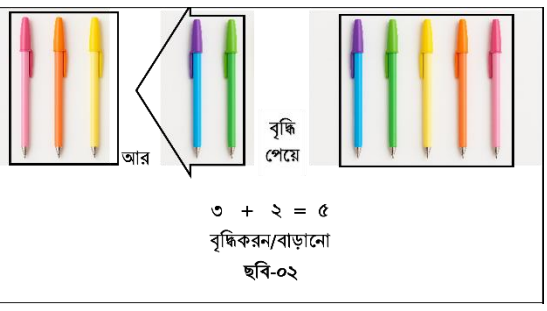

৩ + ২ = ৫
বৃদ্ধিকরন/বাড়ানো
ছবি-০২

১. একত্র করা

যখন দুটি বা তার বেশি সংখ্যাকে পাশাপাশি রেখে তাদের মোট সংখ্যা বের করা হয়, তখন তাকে একত্র করা বলা হয়। উদাহরণ: উপরের ০১ নং ছবিতে একদিকে আছে ২টি এবং অন্যদিকে আছে ১টি কলা। নীল তীর চিহ্নের মাধ্যমে নিচে একত্র করা হয়েছে। উপরের দুই অংশের কলাগুলো নিচে এসে একসাথে ৩টি কলায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, ছবিটি বোঝায় যে ২টি কলার সাথে ১টি কলা যোগ করলে মোট ৩টি কলা পাওয়া যায়। এটি "একত্র করা" বা যোগের একটি সহজ উদাহরণ।

যোগের 'একত্র করা' ধারণা সংক্রান্ত সমস্যা

- মিথিলার কাছে ৪টি রং পেন্সিল এবং মিলার কাছে ৩টি রং পেন্সিল আছে। তাদের কাছে একত্রে রং পেন্সিলের সংখ্যা কত?
- ইভার কাছে ৭টি খেলনা আছে, আনিকার কাছে আছে ৮টি। তাদের একত্রে খেলনার সংখ্যা কত?

এই সমস্যাগুলোর মূল বিষয় হলো 'একত্র করা' দুইজনের জিনিস এক সঙ্গে গুণে মোট বের করা।

২. বৃদ্ধি বা বাড়ানো

'বৃদ্ধিকরণ' বলতে বোঝায় আগে যে পরিমাণ ছিল, তার সাথে আরও কিছু যোগ হয়ে মোট পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। ২নং ছবিতে দেখানো হয়েছে যে বাম পাশে ৩টি কলম ছিল এবং ডান পাশে আরও ২টি কলম আলাদাভাবে যোগ হলো, যেগুলোকে একত্র করলে মোট ৫টি কলম পাওয়া যায়। পুরো ছবিটি আসলে 'বৃদ্ধিকরণ/বাড়ানো' বা যোগের ধারণা সহজভাবে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে দুটি আলাদা পরিমাণকে একত্র করে মোট সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। যেমন: মিন্টুর কাছে ৩টি চকলেট আছে, তার মা তাকে আরও ২টি চকলেট দিলেন। এখন তার মোট ৫টি চকলেট হলো।

যোগের চিহ্ন হচ্ছে '+' এবং '=' হচ্ছে সমান চিহ্ন, যা যোগ অঙ্কে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত ছবিতে '৩+২ = ৫' এর অর্থ হচ্ছে ৩ এর সাথে ২ যোগ করতে হবে। অর্থাৎ ৩ এর ঠিক পর থেকে ২টি সংখ্যা ক্রমিকভাবে বলে যেতে হবে, যেমন, ৪, ৫। অর্থাৎ '৩+২ =৫' এ যোগ অঙ্কে ৩ এর ঠিক পর থেকে ক্রমিকভাবে দুইটি সংখ্যা গুণে গেলে শেষোক্ত সংখ্যা হবে যোগফল, যা হবে ৫।

যোগের 'বৃদ্ধি বা বাড়ানো' ধারণার সমস্যা

- নিলয়ের কাছে ৭টি ক্যান্ডি ছিল। তার মামা তাকে আরও ৩টি ক্যান্ডি দিলেন। এখন মোট ক্যান্ডির সংখ্যা কত?
- বাগানে ৫টি প্রজাপতি উড়ছিল। পরে আরও ৬টি প্রজাপতি এসে যোগ দিল। এখন মোট প্রজাপতি সংখ্যা কত?

এই ধরনের সমস্যায় মূল বিষয় হলো 'বাড়ানো/বৃদ্ধি'। আগের পরিমাণে আরও যুক্ত হওয়া।

যোগ শিখন-শেখানো কৌশল

শিক্ষক বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল শেখানোর পর ধীরে ধীরে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার যোগ, তারপর তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার যোগ, চার অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার যোগ এভাবে পর্যায়ক্রমে যেকোনো অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার যোগ শিখাবেন। প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক উপরে-নিচে এবং পাশাপাশি লিখে যোগ করা উভয়ই শেখাবেন। উপরে-নিচে লিখে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে এককের ঘরের নিচে একক, দশকের ঘরের নিচে দশক, শতকের ঘরের নিচে শতক এভাবে লিখতে অভ্যস্ত হয় তাও শেখাতে হবে। প্রথমে হাতে না রেখে এবং পরে হাতে রেখে কীভাবে যোগ করতে হয় তা শেখাতে হবে। নিম্নে বিভিন্ন স্তরের যোগ অঙ্ক শিখন-শেখানো কৌশল আলোচনা করা হলো।

উদাহরণ: দুই সংখ্যার হাতে রেখে যোগ

$$\begin{array}{r} ৩\ \ ৮ \\ +\ ২\ \ ৪ \\ \hline ৬\ \ ২ \end{array}$$

উপরের উদাহরণটির সমাধানের জন্য ২য় শ্রেণির পাঠ্য বইয়ের ৪৩ নং পৃষ্ঠা লক্ষ্য করি-

যোগ শিখন-শেখানোর মূল কৌশল হলো সংখ্যার স্থানীয়মান অর্থাৎ একক, দশক শতক... স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে হাতে কলমে যোগ করা। এখানে, প্রথমে শিক্ষার্থীকে এককের ঘরের ব্লক গণনা করে যোগ করতে শেখানো হয়েছে। যখন এককের ঘরে মোট ব্লক সংখ্যা ১০ ছাড়িয়ে যায়, তখন সেই ১০টি এককে একটি দশক হিসেবে বাম পাশে স্থানান্তর করে দেখানো হয়েছে। ছবিতে দেখা যায়, ৮ + ৪ যোগ করতে গিয়ে এককের ঘরে মোট ১২টি ব্লক হয়। এখান থেকে ১০টি নিয়ে একটিকে 'দশক' ঘরে সরানো হয় এবং বাকি ২টি এককে থাকে। এরপর দশকের ঘরের ৩+২=৫। ৫দশক এবং পূর্বের ১ দশক মিলে হয় ৬ দশক। এভাবে শিক্ষার্থীকে স্থানীয়মান বজায় রেখে ধাপে ধাপে যোগ করতে শেখালে যোগ শিখন আরও সহজ ও বোধগম্য হয়।

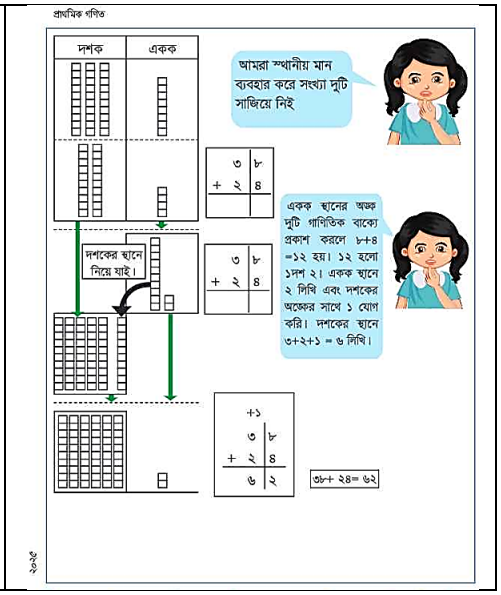

উদাহরণ: তিন বা ততোধিক সংখ্যার যোগ

দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার যোগ শিক্ষাদানের পর পর্যায়ক্রমে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট, চার অঙ্ক বিশিষ্ট প্রভৃতি সংখ্যার উপর-নিচ এবং পাশাপাশি যোগফল শিক্ষাদান করতে হবে। এ পর্যায়ে শিশুরা যেহেতু হাতে রেখে যোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে সেহেতু ৩য় শ্রেণির প্রাথমিক গণিত পাঠ্যবইয়ের ২৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত উদাহরণের অনুরূপভাবে যোগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

এই যোগ অঙ্কটি করতে প্রথমে এককের অঙ্কগুলো (৭ + ২ + ৬) যোগ করা হয়েছে, যার ফল ১৫; তাই এককে ৫ লেখা হয়েছে এবং ১ দশকের ঘরে উপরে লেখা হয়েছে। এরপর দশকের অঙ্কগুলো (৩ + ৭ + ৯) এর সাথে পূর্বের ১ যোগ করে মোট ২০ পাওয়া যায়, তাই দশকে ০ লেখা হয়েছে এবং ২ শতকের ঘরের উপরে লেখা হয়েছে। তারপর শতকের অঙ্কগুলো (৮ + ৫ + ৮) এর সাথে পূর্বের ২ যোগ করে ২৩ পাওয়া যায়, ফলে শতকে ৩ লেখা ও ২ হাজারের ঘরের উপরে লেখা হয়েছে। শেষে হাজারের অঙ্কগুলো (৪ + ২ + ১) এর সাথে পূর্বের ২ যোগ করে মোট ৯ পাওয়া যায়। এভাবে ধাপে ধাপে একক থেকে হাজার পর্যন্ত যোগ করে সমাধানটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

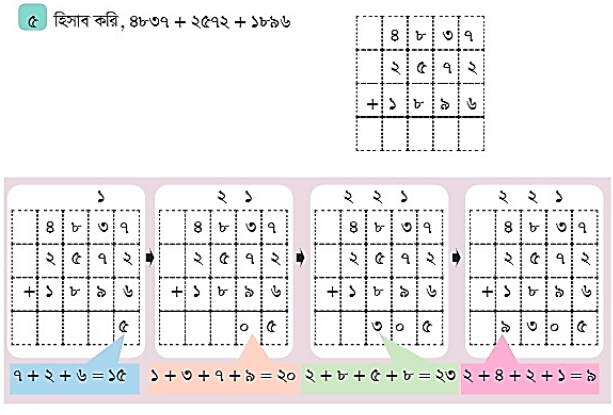

যোগ শিখন-শিখানো কার্যক্রমে উপকরণের ব্যবহার

১. বাস্তব বস্তু (বোতাম/কাঠি/কিউব)-এর ব্যবহার

শিশুদের হাতে ৩টি কাঠি দিই, পরে আরও ২টি দিই। প্রশ্ন করি, 'সবমিলে কয়টি হলো?' ৩ + ২ = ৫

২. লুডুর ছক্কা ব্যবহার:

দুটি লুডুর ছক্কা গড়িয়ে আসা সংখ্যার যোগ করতে বলি। যেমন: ৪ ও ৩ ⟶ ৪ + ৩ = ৭

৩. সংখ্যা রেখা ব্যবহার:

সংখ্যা রেখায় ৫ থেকে শুরু করে ৩ ধাপ এগিয়ে যেতে বলি । ৫ + ৩ ⟶ ৮-এ পৌঁছাবে

৪. চিত্রসম্বলিত কার্ড:

শিশুদের চিত্র সংবলিত কার্ড দেখিয়ে প্রশ্ন করি, ২টি আপেল + ৩টি আপেল। এরপর শিশুকে গুনে বলতে বলি, 'মোট কয়টি আপেল?'

৫. ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহার:

শিশুকে দেখিয়ে বলি, '৬ + ২ =?' শিশুকে বোতাম বা মনে করে উত্তর দিতে বলুন: ৮

বিয়োগ

বিয়োগ হলো যোগের বিপরীত প্রক্রিয়া। বিয়োগের ধারণা সাধারণত বস্তু বাদ দেওয়া, তুলনা করা বা পার্থক্য করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ধরনের বিয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য উপস্থাপিত চিত্রগুলো লক্ষ্য করি। উপস্থাপিত চিত্র ৩টির গাণিতিক প্রকাশ বা ধরন কী হবে এবং গাণিতিক প্রকাশ কী একই রকম হবে, না ভিন্ন রকম হবে তার উত্তর চিন্তা করি।

বিয়োগ সংক্রান্ত নিচের ৩টি গাণিতিক সমস্যা পড়ি এবং এদের ধরন সম্পর্কে চিন্তা করি।

১. পান্না ৫টি আপেল কিনল। এর মধ্যে ২টি খেয়ে ফেলল। তার কাছে আর কয়টি আপেল থাকল?

২. রাকিবের ৫টি আপেল কেনার প্রয়োজন। ২টি কিনলেন। রাকিবের আর কয়টি আপেল কেনা দরকার?

৩. রিমনের ৫টি আপেল আছে। কাননের ২টি আপেল আছে। ২জনের আপেলের সংখ্যার পাথর্ক্য কত?

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর এক হলেও সেখানে বিয়োগের তিনটি আলাদা ধারণা নিহিত আছে। আবার ছবি ৩টিতেও বিয়োগের তিনটি আলাদা ধারণা নিহিত আছে। তা হলো 'বাদ দেয়া', 'তুলনা করা' এবং 'পার্থক্য করা'।

বাদ দেয়া: যখন কোন সামষ্টিক বস্তু থেকে কিছু কর্তন করা হয়, হারিয়ে যায়, ফেলে দেয়া হয় বা নষ্ট হয়ে যায় তখন অবশিষ্ট যা থাকে তা বের করার প্রক্রিয়া হলো বাদ দেয়া।

তুলনা করা: দুটি বস্তুর পরিমাণ যাচাই এবং একটি বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর তুলনা করা।

পার্থক্য করা: একটি বস্তু অন্য বস্তু অপেক্ষা কত কম বা বেশি, তা নির্ণয় করা এবং দুটি সংখ্যার বা দুটি রাশির মাঝখানের ব্যবধান বা পার্থক্য বের করার প্রক্রিয়া।

বিয়োগের চিহ্ন হচ্ছে '-' এবং '=' হচ্ছে সমান চিহ্ন, যা বিয়োগ অঙ্কে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত প্রশ্ন অনুযায়ী, '৫ - ২ = ৩' এর অর্থ হচ্ছে বিয়োজন ৫ থেকে বিয়োজ্য ২ "বাদ দেয়া", "তুলনা করা" এবং "পার্থক্য করা", যার বিয়োগফল হবে ৩। শিশুদের এক অঙ্কের বড় সংখ্যা থেকে এর ছোট সংখ্যা উপর-নিচ বা পাশাপাশি লিখে বিয়োগ করা শেখাতে হয়।

এছাড়া প্রাথমিকভাবে শিশুদের 'হাতে না রেখে বিয়োগ' এবং পরে 'হাতে রেখে বিয়োগ' করা শেখাতে হয়। বিয়োগ সাধারণত যোগ পদ্ধতি, বিয়োগ পদ্ধতি, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সমযোগ পদ্ধতিতে করা হয়।

অনুশীলনী

১. ৮ - ৩ = ৫; এই বিয়োগের গাণিতিক সমস্যার ৩টি অর্থ তৈরি করি।

২. একটি স্কুলে ৫ম শ্রেণিতে ২৫জন শিক্ষার্থী আছে। এর মাঝে ২২জনের বসার জন্য ডেস্ক আছে আর কতটি ডেস্কের প্রয়োজন হবে? এই গাণিতিক সমস্যাটি বিয়োগের কোন ধারণা বহন করে?

বিয়োগ শিখন-শেখানো কৌশল

উদাহরণ: দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা থেকে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার বিয়োগ (হাতে রেখে)

	৪	৫
-	১	৮
	২	৭

এককের ঘরে ৫ থেকে বিয়োজ্য ৮ সরাসরি বিয়োগ করা যাচ্ছে না। কাজেই বিয়োজনের দশকের ঘর থেকে একটি দশ এনে এককের ঘরে যোগ করা হয়েছে। ফলে এককের ঘরে ১৫ হয়েছে। এখন ১৫ থেকে বিয়োজ্যের ৮বিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে। এবং দশকের ঘরে ৩ থেকে ১ বাদ দিয়ে বিয়োগফল ২৭ পাওয়া গেল।

উপরের উদাহরণটির সমাধান প্রাথমিক গণিত বিষয়ের ২য় শ্রেণির পাঠ্য বইয়ের ৫০নং পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করি।

এই বিয়োগ অঙ্কটিতে প্রথমে ৪৫ সংখ্যাটিকে দশক ও এককে ভাগ করে দেখানো হয়েছে ৪টি দশক ও ৫টি একক। যেহেতু ৫ থেকে ৮ বিয়োগ করা যায় না, তাই একটি দশক ভেঙে ১০টি এককে আনা হয়েছে; ফলে এককে হয় ১৫। এরপর এককের ঘরে ১৫ - ৮ = ৭ পাওয়া যায়। বাকি থাকে ৩টি দশক, তাই দশকের ঘরে ৩ - ১ = ২ করা হয়। সবশেষে একক ও দশক স্থানের অঙ্ক বসিয়ে ফলাফল ২৭ পাওয়া যায়। ছবিতে ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে কীভাবে দশক ভেঙে একক বাড়িয়ে বিয়োগ সহজভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

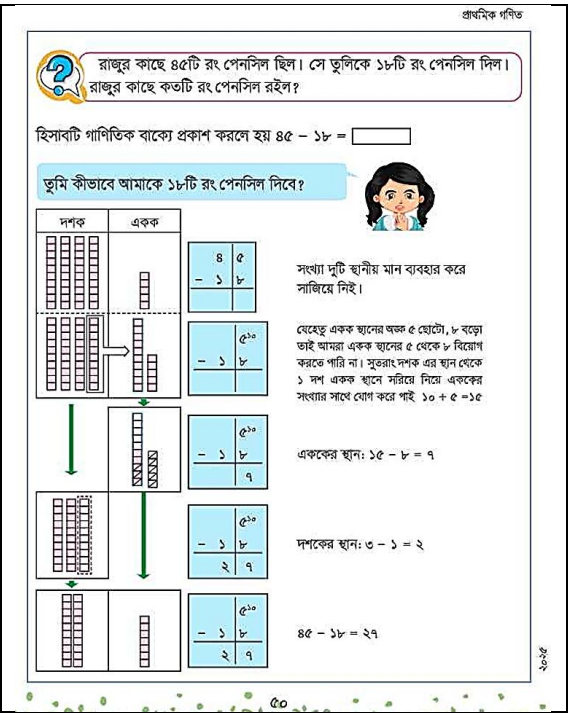

উদাহরণ: ৩য় শ্রেণির প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকের ৩২নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ৪ অঙ্কবিশিষ্ট ২টি সংখ্যার বিয়োগ শিখন-শেখানো কৌশল লক্ষ্য করি।

এই বিয়োগ অঙ্কে প্রথমে ৫৩৪৮ সংখ্যাটিকে চারটি ঘরে (হাজার, শতক, দশক, একক) সাজানো হয়েছে এবং তার নিচে একইভাবে ৩৬৮৫ বসানো হয়েছে। এককের ঘরে দেখা যায় ৮ থেকে ৫ বিয়োগ করে ৩ পাওয়া গেল।

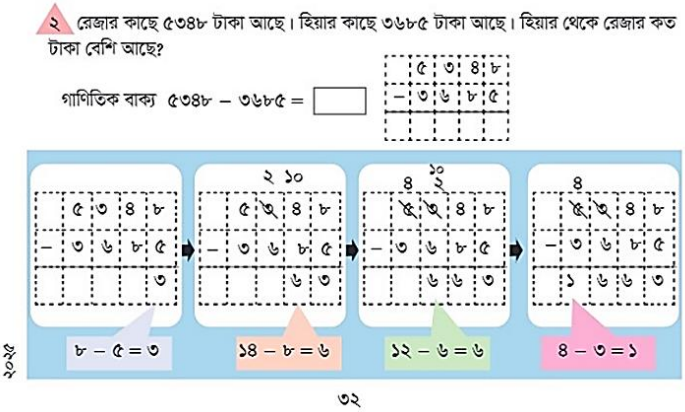

দশকের ঘরের ৪ থেকে ৮ বিয়োগ করা যায় না, তাই শতকের ঘর থেকে ১ শতক বা ১০ দশক এনে ১০+৪=১৪ দশক করা হয়েছে এবং সেখান থেকে ৮ দশক বিয়োগ করে ৬ দশক পাওয়া গেল। যেহেতু শতকের ঘর থেকে ১ শতক বা ১০দশক আনা হয়েছে তাই দশকের ঘরের উপরে +১০ লেখা হয়েছে এবং শতকের ঘরের বিয়োজন ৩ কে কেটে উপরে ২ লেখা হয়েছে। এবার শতকের ঘরের ২ থেকে ৬ বিয়োগ করা যায় না, তাই হাজারের ঘর থেকে ১ হাজার বা ১০ শতক এনে ১০+২=১২ শতক করা হয়েছে এবং সেখান থেকে ৬ শতক বিয়োগ করে শতকের ঘরের বিয়োগফলে ৬ পাওয়া গেল। অনুরুপ কারণে শতকের ঘরে ২ এর উপরে +১০ এবং হাজারের ঘরের ৫-এ কাটা চিহ্ন দিয়ে সেটিকে ৪ করা হয় এবং সবশেষে হাজার ঘরে বাকি থাকে ৪, এবং ৪ - ৩ = ১ পাওয়া যায়। এইভাবে প্রতিটি ঘরে ধার নেওয়া বোঝাতে +১০ লেখা, যে অঙ্ক কমেছে তাকে কাটা চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে এবং পরিবর্তিত সংখ্যার সাহায্যে ধাপে ধাপে বিয়োগ সম্পন্ন করে শেষ বিয়োগফল দাঁড়িয়েছে ৫৩৪৮ - ৩৬৮৫ = ১৬৬৩।

গুণ

দুই বা ততোধিক সমান দলের সংখ্যার সমষ্টিকে বের করার সংক্ষিপ্ত নিয়ম গুণ প্রক্রিয়া নামে পরিচিত। বস্তুতঃ গুণ হচ্ছে দলগত গণনা। কয়েকটি সমান দলের সংখ্যাসমষ্টি যোগ করে বের করা যায় আবার গুণ করেও বের করা যায়। তাই গুণকে এক প্রকার যোগের সংক্ষিপ্ত প্রকরণও বলা যেতে পারে। সর্বপ্রকার গুণ সমস্যাকে যোগ করে বের করা যায়। কিন্তু সবরকম যোগ সমস্যাকে গুণ করে বের করা যায় না। ভিন্ন ভিন্নভাবে দুইটি প্রক্রিয়ারই প্রয়োজন আছে।

উদাহরণ: প্রত্যেক পিরিচে তিনটি করে ডিম আছে এরূপ ৪টি পিরিচে কতগুলো ডিম আছে?

সংখ্যায় প্রকাশ করলে সমস্যাটি এরূপ হইবে: ৩×৪ = কত? যোগ করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। যেমন: ৩+৩+৩+৩ =১২, আবার গুণ করেও সমাধান করা যায়। যেমন: ৩×৪=১২। কিন্তু যে স্থানে সমান দলের যোগ নয় সেক্ষেত্রে গুণ দ্বারা তা সমাধান করা যায় না। যেমন, ৩+৪+৫=১২। এই যোগ সমস্যাকে গুণের সাহায্যে সমাধান করা যায় না।

৩×৪=১২, এই গুণ অঙ্কটিতে ৩ কে বলা হয় গুণ্য, ৪ কে বলা হয় গুণক এবং ১২ কে বলা হয় গুণফল। ‘×’ এই চিহ্নটি গুণ চিহ্ন।

অনুশীলন:

পাশের চিত্রটি ভাল করে দেখে প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করে উত্তর দিই।

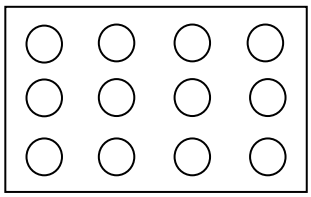

১. প্রতিটি লাইনে কতটি বৃত্ত আছে? লাইনের সংখ্যা কত? মোট বৃত্তের সংখ্যা কত?

প্রতিটি লাইনে বৃত্ত আছে ৪টি। লাইনের সংখ্যা হলো ৩টি।

∴ মোট বৃত্তের সংখ্যা হলো বা ৪×৩ =১২টি

২. প্রতিটি কলামে কতটি বৃত্ত আছে? কলামের সংখ্যা কত? মোট বৃত্তের সংখ্যা কত?

প্রতিটি কলামে বৃত্ত আছে ৩টি। কলামের সংখ্যা ৪টি।

∴ মোট বৃত্তের সংখ্যা ৩ × ৪ = ১২টি

৩. জোড়া জোড়া করে কতটি জোড়া আছে? জোড়া হিসেবে মোট বৃত্তের সংখ্যা কত?
প্রতি জোড়ায় বৃত্ত আছে ২টি। মোট জোড়া আছে ৬টি।
∴ মোট মোট বৃত্ত আছে ২× ৬ =১২টি

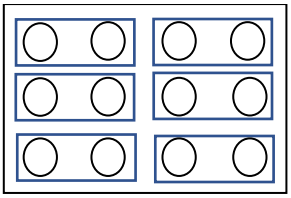

৪. ছয়টি করে কতটি দল হবে? ছয়টির দল হিসেবে মোট বৃত্তের সংখ্যা কত?
ছয়টি করে দল আছে ২টি। প্রতি দলে বৃত্ত আছে ৬টি।
∴ মোট মোট বৃত্ত আছে ৬× ২ =১২টি

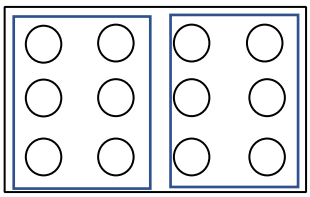

গুণ শিখন-শেখানো কৌশল

১. ১০০ ডটের ছকের সাথে L আকৃতির কাগজ ব্যবহার

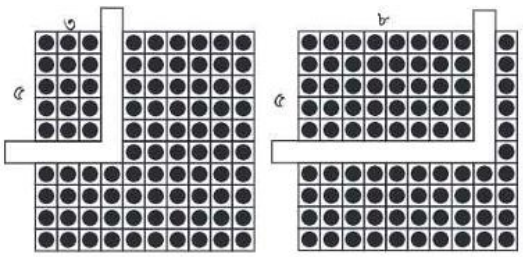

কৌশল: গুণকে দৃশ্যমান করতে **১০×১০ ডটের ছক** ব্যবহার করে প্রথমে সংখ্যাগুলোকে সারি-কলাম আকারে দেখানো হয়।
ব্যবহার: **L-আকৃতির কাঠামো** বসিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যাটি কতবার নেওয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়। যেমন, ৫×৩ মানে ৫-এর ৩টি কলাম, মোট ১৫ ডট। একইভাবে ৫×৪, ৫×৫.... ইত্যাদি উদাহরণও ডট গুনে বোঝানো হয়। এভাবে দৃশ্যমান চিত্রের মাধ্যমে শিশু সহজেই বুঝে ফেলে যে গুণ মানে একই সংখ্যাকে বারবার যোগ করা এবং প্রতিবার কতগুলো করে যুক্ত হচ্ছে তা ছকে সরাসরি দেখা যায়।

২. ফুলের পাপড়ি মডেল

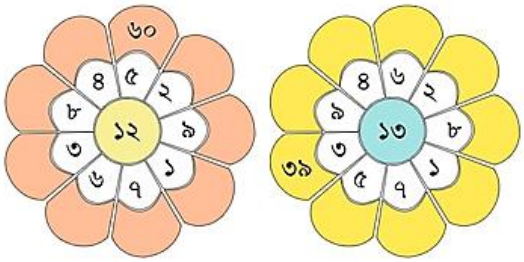

কৌশল: কেন্দ্রে একটি সংখ্যা (যেমন ১২ বা ১৩) এবং চারপাশের পাপড়িতে ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা লিখে গুণফল বের করা।
ব্যবহার: শিক্ষার্থীদের গুণের নামতা চিত্রের মাধ্যমে শেখাতে প্রতিটি পাপড়ির মান কেন্দ্রের সংখ্যার সঙ্গে গুণ করে খালি স্থানে ফল লেখা হয়। এতে শিশুরা ১২×১... ১২×৯ বা ১৩×১...১৩×৯ এর সম্পূর্ণ নামতা সহজে শিখে গুণ করতে পারে।

৩. মিলিয়ে দেখা/দাগ টেনে মিল করি

১৪ × ১	৫৬
১৪ × ২	১৪০
১৪ × ৩	২৮
১৪ × ৪	১১২
১৪ × ৫	৮৪
১৪ × ৬	৯৮
১৪ × ৭	১৪
১৪ × ৮	১২৬
১৪ × ৯	৭০
১৪ × ১০	৪২

কৌশল: বাম পাশে গুণের প্রশ্ন এবং ডান পাশে এলোমেলো গুণফল লিখে দুটোকে দাগ টেনে মিলানো।
ব্যবহার: যেমন ১৪×৩, ১৪×৫, ১৪×৮ ইত্যাদি বাম পাশে এবং ৪২, ৭০, ১২৬ ডান পাশে। শিশুকে সঠিক গুণফলের দিকে দাগ টেনে যুক্ত করতে হয়। এতে সমীকরণ-ফলাফলের সম্পর্ক পরিষ্কার হয় এবং মানসিক গণনার দক্ষতা বাড়ে।

৪. বার মডেল/রিয়েল লাইফ মডেল

কৌশল: বাস্তব উদাহরণ (যেমন বিস্কুটের প্যাকেট) ব্যবহার করে প্রতিটি প্যাকেটের দাম সমান বার দিয়ে দেখানো।

ব্যবহার: যেমন ২৩ টাকা × ৩ দেখাতে ২৩ টাকার তিনটি বার দেখানো হয়। নাম্বার লাইনে ২৩→৪৬→৬৯ এভাবে এগিয়ে গুণের ফল নির্ণয় করা হয়। এতে গুণ মানে পুনরাবৃত্তিক যোগ-তা খুব স্পষ্ট হয়।

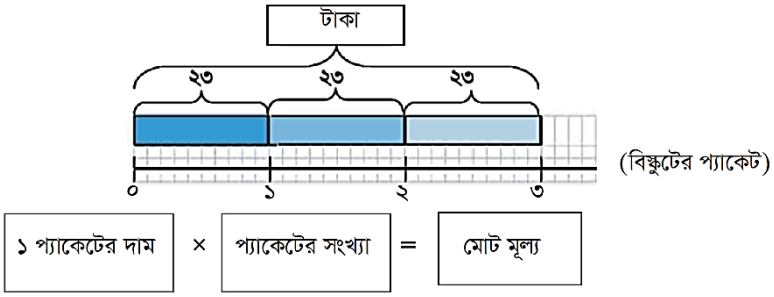

৫. দশক-একক ব্লক মডেল

কৌশল: সংখ্যা ভাঙার জন্য ১০-এর ব্লক ও ১-এর ব্লকের ব্যবহার।

ব্যবহার: যেমন ২৩×৩ করতে ২৩ = ২০ + ৩, তারপর ২০×৩ এবং ৩×৩ আলাদা করে ব্লক দিয়ে দেখানো হয়। শেষে ফলগুলো যোগ করা হয়। এতে বড় সংখ্যার গুণ সহজ হয় এবং স্থানীয় মান বোঝা যায়।

৬. শতক-দশক-একক ব্লক

কৌশল: বড় সংখ্যা ভাঙার জন্য শতক (১০০), দশক (১০) ও এককের (১) ব্লক ব্যবহার।

ব্যবহার: যেমন ২১৩×৩ করতে ২০০, ১০ এবং ৩ ব্লকে সাজিয়ে আলাদা সারিতে ×৩ করা হয়। প্রতিটি অংশের ফল (৬০০, ৩০, ৯) যোগ করে মোট গুণফল পাওয়া যায়। এতে জটিল গুণ খুব সহজ হয়।

৭. সংখ্যা ভেঙে গুণ করার পদ্ধতি

কৌশল: গুণের সংখ্যাকে স্থানীয় মানে ভেঙে ছোট ছোট গুণে ভাগ করা।

ব্যবহার: যেমন ১৭×৩ করতে ১৭ = ১০ + ৭, (১০×৩) + (৭×৩) । এতে বড় সংখ্যার গুণ শেখাতে শিশুর মনে ধাপে ধাপে ধারণা তৈরি হয়।

৮. এরিয়া মডেল/বক্স মডেল

কৌশল: দুটি সংখ্যাকে ভেঙে ২×২ বা ৩×৩ বক্সে গুণফল বসানো।

ব্যবহার: যেমন, ২১×১৩ →(২০+১) এবং (১০+৩) নিয়ে চারটি ঘরে ২০০, ৬০, ১০, ৩ বসিয়ে যোগ করলে ২৭৩ পাওয়া যায়। এটি পরবর্তী ক্লাসের বীজগণিতের প্রস্তুতি।

২১ ও ১৩ কে স্থানীয় মানে প্রকাশ করি।

২১ = ২০ + ১
১৩ = ১০ + ৩

	২০	১
১০	২০০	১০
৩	৬০	৩

২০০
৬০
১০
৩
২৭৩

৯. গুণের কার্ড

কৌশল: গুণের কার্ডে সামনে গুণ এবং পেছনে গুণফল লিখা থাকে। এই কার্ড দিয়ে খেলার মাধ্যমে গুণ শেখানো যায়।

ব্যবহার:

- কার্ড উল্টে মিলানো
- বন্ধুদের সাথে দ্রুত উত্তর বলার খেলা
- উত্তর দেখে আবার গুণ হিসাব করা
- এতে শিশু গুণের নামতা দ্রুত শিখে এবং ভুল ধরতে পারে।

ভাগ

বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগেই শিশুরা ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কিছু বাস্তব ধারণা পেয়ে যায়। বাবা-মা যখন বাইরে থেকে বিস্কুট, চকলেট বা ফল এনে বলেন 'সমান ভাগ করে খাও' তখনই তাদের মাঝে ভাগের অভিজ্ঞতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। দক্ষ শিক্ষক চাইলে এই বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলোকে শ্রেণিকক্ষে কাজে লাগাতে পারেন। স্কুল ও বাড়ির দৈনন্দিন জীবনে শিশুর যে ভাগ করার অভ্যাস তৈরি হয়, সেই অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করে অর্থপূর্ণভাবে ভাগ শেখানো সম্ভব।
ভাগের ধারণা প্রদানের জন্য নিচের ৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের ৬৩ পৃষ্ঠার উদাহরণটি লক্ষ্য করি।

১২ টি বিস্কুট যদি ৩ জনকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়, তবে প্রত্যেকে কয়টি করে বিস্কুট পাবে?

(ক) ১২ টি বিস্কুট থেকে ৩ টি করে বিস্কুট কতবার বাদ দেওয়া যায়?	(খ) ১২ টি বিস্কুটের মাঝে ৩টি করে বিস্কুট কতবার আছে?
১২ - ৩ ৯ - ৩ ৬ - ৩ ৩ - ৩ ০	

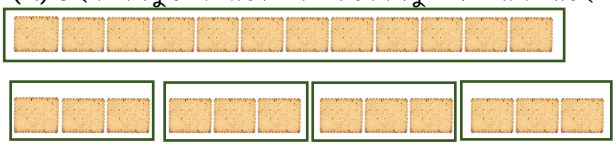

অর্থাৎ ১২ থেকে ৩, ৪ বার বাদ বা বিয়োগ করা যায়। কাজেই ১২টি বিস্কুট ৩ জনের মধ্যে ভাগ করলে ৪টি করে পাবে।

কাজেই ভাগ বলতে (ক) একটি সংখ্যা থেকে আরেকটি সংখ্যা কতবার বিয়োগ করা যায় বা (খ) একটি সংখ্যার মাঝে আরেকটি সংখ্যা কতবার আছে, তা বের করার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিকে বুঝায়। '÷' এই প্রতীকটি ভাগ প্রক্রিয়ার প্রতীক বা ভাগ চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ১২ কে ৩ দিয়ে ভাগ বুঝাতে ১২ ÷ ৩ এভাবে লিখা হয়।

ভাগ দুই প্রকার। যথা পরিমাপে ভাগ ও বন্টনে ভাগ।

পরিমাপে ভাগ: যে ভাগে দলের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় তাকে পরিমাপে ভাগ বলে।
উদাহরণ: প্রত্যেক পাত্রে ৫টি করে আম রাখা যায়। ২০টি আম রাখতে এরূপ কয়টি পাত্রের প্রয়োজন হবে?
২০÷ ৫= ৪। ভাগফল ৪ অর্থাৎ ২০টি আম রাখতে ৪টি পাত্রের প্রয়োজন।

বণ্টনে ভাগ: যে ভাগে দলের সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করা হয় তাকে বন্টনে ভাগ বলে
উদাহরণ: ২০টি আম সমান ভাগে ৫টি পাত্রে রাখলে প্রত্যেক পাত্রে কয়টি আম থাকবে?
২০÷৫ = ৪ অর্থাৎ প্রত্যেক পাত্রে ৪টি আম থাকবে।

ভাগের সাথে বিয়োগ ও গুণের সম্পর্ক

২০ থেকে ৫, ৪ বার বাদ দেওয়া যায়। অর্থাৎ ২০÷ ৫=৪। অপর কথায় বলা যায়, ভাগ বিয়োগের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া। আবার ২০ কে ৫ দিয়ে ভাগ করা মানে ৫ এর সাথে কত গুণ করলে ২০ হয় তা বের করা। কাজেই দেখা যায় ভাগের সাথে গুণের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ভাগকে গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে।

ভাগ শিখন-শেখানো কৌশল

১. বাস্তব বস্তু দিয়ে ভাগ

এখানে ভাগ শেখাতে বাস্তব বস্তুর ছবি (যেমন বিস্কুট=১২টি) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর সামনে প্লেট আঁকা হয়েছে এবং বিস্কুটগুলো এক এক করে তিন শিশুর মধ্যে সমানভাবে দেওয়া হয়েছে। এতে বাচ্চারা সরাসরি দেখতে পারে যে ভাগ মানে সবার মধ্যে সমান করে বণ্টন করা। এই কৌশলে শিক্ষার্থীরা 'equal sharing' বা 'প্রত্যেকে কত পায়'-এই ধারণা বাস্তব উদাহরণ থেকেই বুঝে ফেলে।

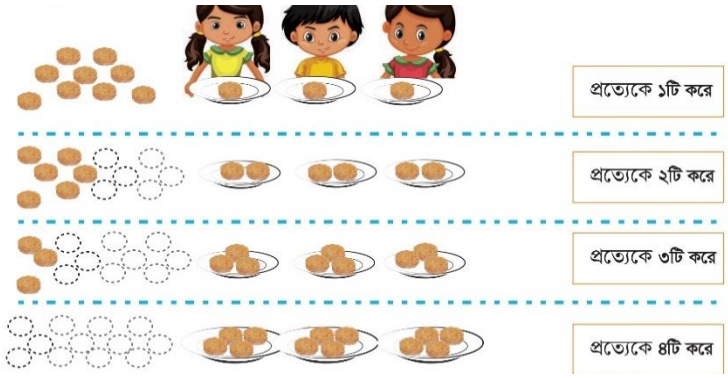

২. সারি-কলাম ডট অ্যারে ব্যবহার করে ভাগ

এখানে ১৫টি ডট ৫×৩ আকারে দেখানো হয়েছে এবং নিচে পাঁচটি খালি বাক্স রাখা হয়েছে। তীর চিহ্ন ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে এক ডট অ্যারে থেকে পাঁচ ভাগে কিভাবে বণ্টন করা হয়। শিক্ষার্থীরা ডটগুলোকে পাঁচ গ্রুপে ভাগ করে প্রতিটি গ্রুপে কতটি ডট আছে তা নির্ধারণ করে। এই পদ্ধতি ভাগের ভিজ্যুয়াল বোঝাপড়া তৈরি করে এবং 'দলগত ভাগ' শেখায়।

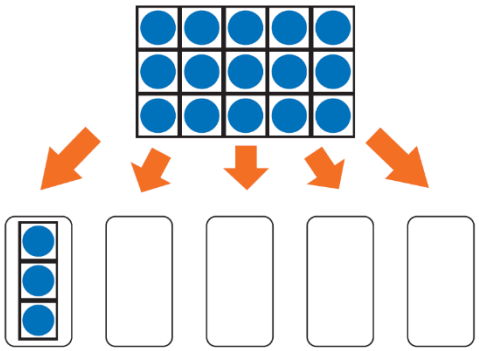

৩. ডট-স্ট্রিপ মডেল দিয়ে ভাগ

এখানে ২০টি কলা ভাগ করতে ডট স্ট্রিপ (○○○○○) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি স্ট্রিপ একজন শিশুকে দেওয়া হচ্ছে। যেমন, ১টি কলা ৫ জন, ২টি কলা ৫ জন, ৩টি কলা ৫ জন... এভাবে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি স্ট্রিপ মানে একটি গ্রুপ। শিশুরা স্ট্রিপ গুনে বুঝে যে ৪টি করে দিলে ৫ জন শিশুকে দেওয়া যাবে। এর মাধ্যমে ভাগ ও গুণের সম্পর্ক (৪×৫=২০ ⟶ ২০÷৫=৪) পরিষ্কার হয়।

[১] যখন আমরা ৫ জন শিশুকে ১টি করে কলা দিই, তখন কলার মোট সংখ্যা হয়

১ × ৫ = ৫

[২] যখন আমরা ২টি করে কলা দিই, তখন কলার মোট সংখ্যা হয়

২ × ৫ = ১০

[৩] যখন আমরা ৩টি করে কলা দিই, তখন কলার মোট সংখ্যা হয়

[৪] যখন আমরা ৪টি করে কলা দিই, তখন কলার মোট সংখ্যা হয়

৪. গুণ ব্যবহার করে ভাগ

এখানে গুণের নামতা ব্যবহার করে ভাগ শেখানো হয়েছে। যেমন-

৫ × ১ = ৫

৫ × ২ = ১০

৫ × ৩ = ১৫

৫ × ৪ = ২০

তারপর বলা হয়েছে, ২০ ÷ ৫ = ?

অর্থাৎ "কোন সংখ্যাকে ৫ দিয়ে গুণ করলে ২০ পাওয়া যায়?" এই কৌশলে শিশুরা ভাগকে উল্টো গুণ হিসেবে দেখতে শেখে-এটি ভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।

৫. ১০-এর গুচ্ছ দিয়ে ভাগ

৮০ ভাগ ৮ শেখাতে ১০ লেখা ব্লক (দশকের গুচ্ছ) ব্যবহার করা হয়েছে। ৮০ = ৮টি ১০-ব্লকে দেখানো হয়েছে এবং তা ৮জন শিশুর মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হয়েছে। প্রতিটি শিশু একটি গুচ্ছ পেয়ে ১০টি কাগজ পায়। এটি ভাগ শেখানোর খুব স্পষ্ট কৌশল, কারণ এই কৌশল ব্যবহার করলে বড় সংখ্যার ভাগ সহজে বোঝানো যায়।

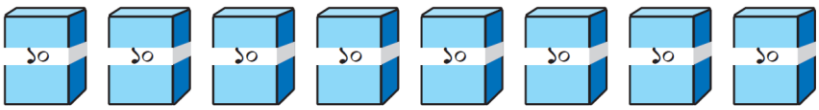

গাণিতিক বাক্য ৮০ ÷ ৪ = ☐

৮. আঙুল ব্যবহার করে ভাগের ধাপ শেখানো

শেষ ছবিতে আঙুল দিয়ে সংখ্যার একটি অংশ ঢেকে ভাগ শেখানো হয়েছে। উদাহরণ: 'আমরা ৯ ÷ ৪৫ করতে পারি না'-আঙুল দিয়ে ঢেকে দেখানো হয় যে ভাজ্যের প্রথম অঙ্ক যদি ভাজকের চেয়ে ছোট হয় তাহলে সেই অঙ্ক দিয়ে ভাগ করা যায় না। তারপর দুই অঙ্ক একসাথে নিয়ে ৯৪ ÷ ৪৫ করা শেখানো হয়। এটি বড় সংখ্যার ভাগ শেখানোর গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যেখানে আঙুল সংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ লক্ষ্য করাতে সাহায্য করে।

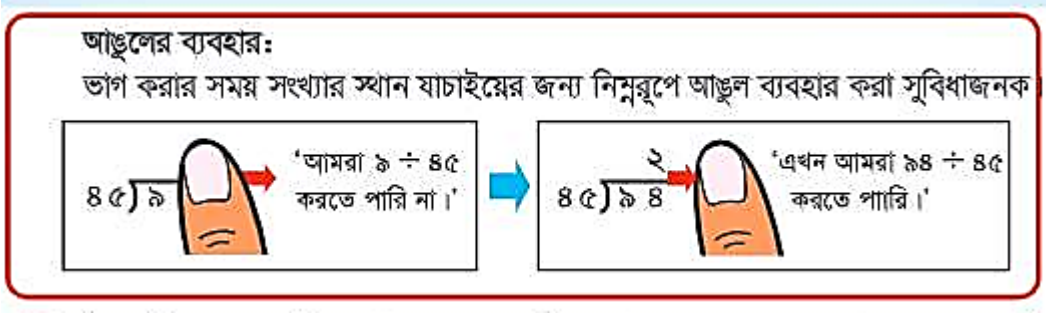

ভাগ সম্পর্কিত সমস্যা

১. একটি বিস্কুট কারখানায় ১৫০ জন কর্মচারী কাজ করেন। এক বছরের ব্যবসায় তাদের ৪৬.৮০,০০০ টাকা লাভ হলো।

(ক) কারখানার প্রতি মাসে কত টাকা লাভ হলো?

(খ) এক বছরের লাভের টাকাকে কর্মচারীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কত টাকা করে পাবেন?

২. শূন্যস্থান পূরণ করি।

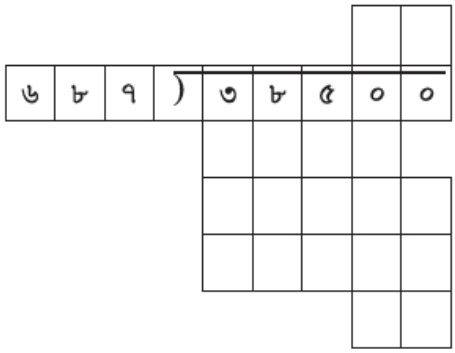

৩. সঠিক কি না যাচাই করি।

(ক) ৯৭৫০০ ÷ ১৮৬ এর ভাগফল ৫২৩ এবং ভাগশেষ ২২২

(খ) ৩৯৪৯৩ ÷ ৩২১ এর ভাগফল ১২৩ এবং ভাগশেষ ১০

প্রাথমিক চার নিয়ম

গণিত একটি যুক্তিনির্ভর বিষয়, যা বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার সমাধানে ব্যবহৃত হয়। এই অধ্যায়ে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গণিত শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করার জন্য চারটি মৌলিক গাণিতিক নিয়ম **যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ** আলোচনা করা হয়েছে। এই নিয়মগুলো শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব প্রয়োগেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে শুধুমাত্র নিয়ম মুখস্থ করিয়ে দিলে নয়, বরং শিশুরা যেন বুঝে ধাপে ধাপে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে শেখে, সেটিই শিক্ষকের দায়িত্ব। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ও শিশু-কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো কৌশল যেমন: বাস্তব উপকরণ ব্যবহার, চিত্রায়ন, গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন, দলগত কাজ এবং চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া।

প্রাথমিক চার নিয়ম সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের শিখন-শেখানো কৌশল

প্রাথমিক চার নিয়ম সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের শিখন-শেখানো কৌশল আলোচনার জন্য আমরা ৫ম শ্রেণির প্রাথমিক গণিত বইয়ের ২২নং পৃষ্ঠার উদাহরণ বিবেচন করি। গাণিতিক সমস্যাটি হলো-

‘বাজারে প্রতি কেজি বাসমতি চাল ২৪০ টাকা এবং প্রতি কেজি মুগ ডাল ১২০ টাকা। যদি ৫ কেজি চাল ও ৩ কেজি ডাল কেনা হয় এবং বিক্রেতাকে ২০০০ টাকা দেওয়া হয়, তাহলে কত টাকা ফেরত পাওয়া যাবে?’

এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধানের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে সমস্যাটি কয়েকবার পড়ার নির্দেশনা দিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করি।

- সমস্যাটিতে কী কী তথ্য দেওয়া আছে?
- সমস্যাটিতে কী বের করতে বলা হয়েছে?
- সমস্যাটি সমাধানের জন্য গাণিতিক কী কী প্রক্রিয়ার কাজ করতে হবে?
- সমস্যাটি সমাধানের জন্য কয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে?

প্রশ্নগুলোর আলোকে উপরের গাণিতিক সমস্যাটির নিম্নরূপ উত্তর প্রদানে সহায়তা করি। এখানে-

- ১ কেজি বাসমতি চালের দাম ২৪০ টাকা দেওয়া আছে এবং ৫ কেজি চালের দাম বের করতে হবে।
- ১ কেজি মুগ ডালের দাম ১২০ টাকা এবং ৩ কেজি মুগ ডালের দাম বের করতে হবে।

- ৫ কেজি চাল ও ৩ কেজি ডালের মোট দাম বের করতে হবে।
- বিক্রেতাকে দেওয়া ২০০০ টাকা থেকে ক্রয়কৃত জিনিসের মোট দাম বিয়োগ করে ফেরতযোগ্য টাকা বের করতে হবে।
- যোগ, বিয়োগ ও গুণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ৪টি ধাপে সমস্যাটির সমাধান করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ ধাপ অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধানে সহায়তা করি।

ধাপ-০১

১ কেজি বাসমতি চালের দাম ২৪০ টাকা

তাহলে ৫ কেজি বাসমতি চালের দাম (২৪০ × ৫) = ১২০০ টাকা

ধাপ-০২

১ কেজি মুগ ডালের দাম ১২০ টাকা

তাহলে ৩ কেজি মুগ ডালের দাম (১২০ × ৩) = ৩৬০ টাকা

ধাপ-০৩

৫ কেজি চাল ও ৩ কেজি ডালের মোট দাম = (১২০০ + ৩৬০) =১৫৬০ টাকা

ধাপ-০৪

ফেরত পাওয়া যাবে (২০০০ - ১৫৬০) =৪৪০ টাকা

এরপর শিক্ষার্থীগণকে প্রশ্ন করি গাণিতিক সমস্যাটি সমাধানের জন্য হিসাবের ধারাবাহিকতা কী হবে?

হিসাবের ধারাবাহিকতা: ২০০০ - {(২৪০ × ৫) + (১২০ × ৩)}

হিসাবের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো শিক্ষার্থীগণকে অনুশীলন করিয়ে উপরের হিসাবের সমাধান করি।

হিসাবের নিয়ম

১। বাম থেকে ডানে হিসাব করি।

২। প্রথমে গুণ ও ভাগের যেটি বামে থাকবে সেটির কাজ আগে করি তারপর যোগ বিয়োগের কাজ করি।

৩। বন্ধনী থাকলে বন্ধনীর ভিতরেরগুলো আগে হিসাব করি। প্রথমে প্রথম বন্ধনী (), পরে দ্বিতীয় বন্ধনী {} এবং তৃতীয় বন্ধনীর [] কাজ করি।

এই নিয়ম অনুযায়ী উপরের হিসাবটি বের করি।

২০০০ – {(২৪০ × ৫) + (১২০ × ৩)}

= ২০০০ – (১২০০ + ৩৬০)

= ২০০০ – ১৫৬০

= ৪৪০

প্রাথমিক চার নিয়ম সম্পর্কিত সমস্যা

১। আমির, হেলাল, ফাতেমা এবং জামিল ৪ ভাইবোন মিলে তাদের বাসার জন্য আসবাবপত্র কিনতে একটি দোকানে গিয়েছিল। তারা ১৬৪৫০ টাকা দরে ২টি খাট, ২৭৫০০ টাকা দরে ১ টি আলমারি এবং ২৮০০ টাকা দরে ৬টি চেয়ার কিনল এবং মোট মূল্য ৪ ভাইবোন সমানভাবে ভাগ করে দিলো। প্রত্যেকে কত টাকা করে দিলো?

২। মাহমুদ সাহেবের মাসিক বেতন ৩৫০০০ টাকা। প্রতি মাসে তিনি ১৮০০০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ এবং ১৫৬৫০ টাকা পরিবারের প্রয়োজন বাবদ খরচ করেন। অবশিষ্ট টাকা তিনি একটি ব্যাংকে জমা রাখেন। তিনি বছরে কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন?

৩। হিসাব করি

১. ১৮ ÷ [১ + ৪ ÷ {১ +৫ ÷ (১ +৮ ÷ ২০}]

২. ৭ × [৬+ {২৪ - (৯ + ২ - ১)}]

ঐকিক নিয়ম

গণিত শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান শেখানো। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় হিসাব শেখাতে ঐকিক নিয়ম একটি কার্যকর পদ্ধতি। ঐকিক নিয়ম হচ্ছে গণিতের একটি ব্যবহারিক কৌশল, যা দিয়ে শিক্ষার্থীরা সহজেই দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধান করতে পারে। এই নিয়মে প্রথমে ১টি (একক) জিনিসের মান বের করা হয়, তারপর একটির সাথে তুলনা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জিনিসের মান নির্ণয় করা হয়।

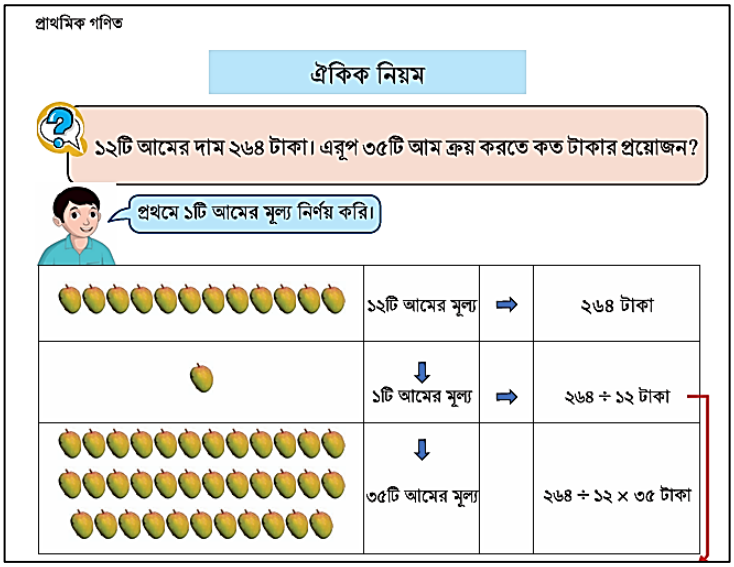

এই ছবিতে ঐকিক নিয়মের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান শেখানোর জন্য একটি চিত্রভিত্তিক ও ধাপে ধাপে প্রথমে ভাগ ও পরে গুণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহায়ক। ছবিতে প্রথমে ১২টি আমের মোট মূল্য ২৬৪ টাকা দেওয়া হয়েছে। এরপর ঐকিক নিয়ম অনুসারে একক রাশির মান নির্ণয় করা হয়েছে- ১টি আমের দাম বের করতে ২৬৪ ÷ ১২ করা হয়েছে। তারপর প্রয়োজনীয় রাশির হিসাবের জন্য ১টি আমের দামকে ৩৫ দিয়ে গুণ করা হয়েছে। এইভাবে ছবির মাধ্যমে ধাপে ধাপে ভাগ ও গুণ প্রয়োগ করে ঐকিক নিয়মের ব্যবহার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেন শিক্ষার্থীরা সহজে ধারণাটি আত্মস্থ করতে পারে।

এখন এই গাণিতিক সমস্যাটি কিভাবে শিক্ষার্থীদের শেখানো যায় তার কৌশল ব্যাখ্যার জন্য শুরুতে শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগ সহকারে সমস্যাটি পড়ার নির্দেশনা দিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করি।

- সমস্যাটিতে কী কী তথ্য দেওয়া আছে?
- সমস্যাটিতে কী বের করতে বলা হয়েছে?
- সমস্যাটি সমাধানের জন্য গাণিতিক কী কী প্রক্রিয়ার কাজ করতে হবে?
- সমস্যাটি সমাধানের জন্য কয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে?

প্রশ্নগুলোর আলোকে উপরের গাণিতিক সমস্যাটির নিম্নরূপ উত্তর প্রদানে সহায়তা করি। এখানে-

- ১২টি আমের মূল্য ২৬৪ টাকা দেওয়া আছে।
- ৩৫টি আমের মূল্য বের করতে হবে।
- ভাগ ও গুণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ২টি ধাপে সমস্যাটির সমাধান করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ ধাপ অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধানে সহায়তা করি।

ধাপ ০১-এ শিক্ষার্থীদের ১ টি আমের মূল্য বের করতে বলি।

১২ টি আমের মূল্য ২৬৪ টাকা

তাহলে ১টি আমের মূল্য ২৬৪ ÷ ১২ টাকা

= ২২ টাকা

ধাপ ০২-এ শিক্ষার্থীদের ৩৫ টি আমের মূল্য বের করতে বলি।

১টি আমের মূল্য ২২ টাকা

তাহলে ৩৫টি আমের মূল্য ২২ × ৩৫ টাকা

= ৭৭০ টাকা

অনুশীলন:

নিচের সমস্যাগুলোর অনুরূপ ঐকিক নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করা যায় এমন কিছু বাস্তব সমস্যা তৈরি করি

- ৩টি বইয়ের দাম ৩৬০ টাকা। তাহলে ১টি বইয়ের দাম কত?
- ১০ কিমি যেতে অটোরিকশা ভাড়া ১০০ টাকা হলে, ১ কিমি যেতে ভাড়া কত হবে?
- .....
- .....
- .....

এই উদাহরণগুলো শিশুদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়, ফলে তারা সহজেই ঐকিক নিয়মের প্রয়োগ বুঝতে পারে। ঐকিক নিয়মের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান সাধারণত দুইটি ধাপে গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে করতে হয়। প্রথম ধাপে ১টি জিনিসের মান বের করা হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জিনিসের মান নির্ণয় করা হয়।

ঐকিক নিয়ম সম্পর্কিত সমস্যা

১. ২০০০ টাকা বিনিয়োগে মুনাফা হয় ২০০ টাকা। ৫০০ টাকা মুনাফার জন্য কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে?

২. ৮ কেজি আটার মূল্য ৩৮৪ টাকা হলে, ৪৩২০ টাকা দিয়ে কত কেজি আটা কেনা যাবে?

৩. ১৬ জন শ্রমিক ৭ দিনে একটি দেয়াল নির্মাণ করে।

(ক) ৪ জন শ্রমিকের ঐ দেয়ালটি নির্মাণ করতে কতদিন লাগবে?

(খ) দেয়ালটি ২ দিনে নির্মাণ করতে অতিরিক্ত কতজন শ্রমিক লাগবে?

৪. একটি কুয়া খুঁড়তে ৮জন ব্যক্তির ২ দিন সময় লাগে। তাহলে ২ জন ব্যক্তির ঐ কুয়া খুঁড়তে কতদিন লাগবে?

গাণিতিক প্রতীক ও বাক্য

গাণিতিক প্রতীক ও বাক্য প্রাথমিক গণিত শেখার ভিত্তি তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা যখন প্রতীকগুলো চিনতে, বুঝতে এবং গাণিতিক বাক্য (number sentences) তৈরি করতে শেখে, তখন তাদের সমস্যা সমাধান, যুক্তি-চিন্তা ও গণনাক্ষমতা দ্রুত উন্নয়ন হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গাণিতিক ধারণাগুলি সহজ, স্পষ্ট এবং কার্যকরীভাবে উপস্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে গাণিতিক প্রতীক ও বাক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাণিতিক প্রতীক যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন গণনা বা হিসাবের কাজ সম্পাদন করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তেমনি গাণিতিক বাক্যও শিখতে এবং বুঝতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে।

এছাড়া, প্রতীক ও বাক্যের মাধ্যমে শিশুদের গাণিতিক সম্পর্কের সঠিক ধারণা তৈরি হয়, যা তাদের গণনার দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। এই বিষয়টি শিক্ষক হিসেবে আমাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ন, কারণ এর মাধ্যমেই আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাণিতিক চিন্তা, বিশ্লেষণ এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারি।

গাণিতিক প্রতীক (Mathematical Symbol)

শিশুরা শুরুতে বাস্তব জিনিসের সাহায্যে গণনা শেখে। ধীরে ধীরে সংখ্যা ও তাদের মধ্যকার গাণিতিক প্রক্রিয়া বা সম্পর্ককে লিখিতভাবে প্রকাশ করার জন্য বিশেষ চিহ্নের প্রয়োজন দেখা দেয়, সেই বিশেষ চিহ্নগুলোকেই গাণিতিক প্রতীক বলা হয়। গাণিতিক প্রতীক হলো এমন বিশেষ চিহ্ন বা প্রতীক যা গাণিতিক ধারণা বা সম্পর্ককে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

প্রতীক	নাম	অর্থ / ব্যবহার
০-৯	সংখ্যা	পরিমাণ প্রকাশ
+	যোগ	একত্র করা
-	বিয়োগ	বাদ দেয়া
=	সমান	দুই পাশের মান সমান
>	বড়	বামপাশের সংখ্যা ডানপাশের চেয়ে বড়

এগুলো গাণিতিক কাজ সম্পাদনে ব্যবহৃত হয় এবং গণনা বা হিসাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়। প্রতীক হলো গণিতের ভাষা। শিশুরা যখন প্রতীক বুঝতে শেখে, তখন তারা সংখ্যা, রাশি, সম্পর্ক এবং প্রক্রিয়াগুলোকে খুব দ্রুত ধরে ফেলতে পারে। প্রতীক শেখানোর মূল লক্ষ্য হলো জটিল গণিত সহজ করে তোলা।

গাণিতিক প্রতীকের শ্রেণিবিভাগ: গাণিতিক প্রতীকগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়-

ক) সংখ্যা প্রতীক (Digit Symbols)

যে প্রতীকগুলো সংখ্যা লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সংখ্যা প্রতীক। সংখ্যা প্রতীকগুলো হলো- ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯। এগুলো দিয়ে সংখ্যা গঠিত হয়।

খ) প্রক্রিয়া প্রতীক (Operation Symbols)

যে প্রতীকগুলো চার প্রক্রিয়া/নিয়ম-এর জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় প্রক্রিয়া প্রতীক। প্রক্রিয়া প্রতীকগুলো হলো-

প্রতীক	নাম	ব্যবহার
+	যোগ	দুটি রাশি মিলানো
–	বিয়োগ	কমানো
×	গুণ	পুনরাবৃত্ত যোগ
÷ অথবা /	ভাগ	সমান ভাগ

গ) সম্পর্ক প্রতীক (Relation Symbols)

যে প্রতীকগুলো সংখ্যার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সম্পর্ক প্রতীক। সম্পর্ক প্রতীকগুলো হলো-

প্রতীক	অর্থ
=	সমান
>	বৃহত্তর
<	ক্ষুদ্রতর
≠	সমান নয়
≮	ক্ষুদ্রতর নয়
≯	বৃহত্তর নয়

এছাড়াও আমরা গাণিতিক কাজ সম্পাদনে আরো কিছু অন্যান্য দরকারি প্রতীক ব্যবহার করে থাকি। যেমন-

প্রতীক	নাম	অর্থ
%	শতাংশ	প্রতি ১০০-তে কত
( )	বন্ধনী	কোন অংশ আগে করা হবে
:	অনুপাত	তুলনামূলক সম্পর্ক
.	দশমিক বিন্দু	পূর্ণ সংখ্যা ও ভগ্নাংশ আলাদাভাবে প্রকাশ করা

অনুশীলন:

ক) ৫ × ৭ ☐ ৩৫

খ) ২৮ + ১৯ ☐ ৩৭

গ) ৮ + ৩ × ৪ ☐ (৮ + ৩) × ৪

ঘ) ৫৩ − ১৮ + ১৩ ☐ ৫৭ − (৮ × ৩)

গাণিতিক বাক্য (Number Sentence)

গাণিতিক বাক্য হলো এমন একটি বাক্য যেখানে সংখ্যা, প্রতীক এবং কখনো কখনো অজানা মান থাকে এবং একটি সম্পর্ক বা সমীকরণ প্রকাশ করে। গাণিতিক বাক্যে সংখ্যা প্রতীক, প্রক্রিয়া প্রতীক এবং সম্পর্ক প্রতীক ব্যবহার করা হয়। গাণিতিক বাক্য ভুল বা সঠিক হতে পারে।

অনুশীলন:

১। নিচের গাণিতিক বাক্যগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল?

ক) ২৭ + ১৬ = ৪৩

খ) ২৪ ÷ ৪ = ৮

গ) ৮ × ৫ = ৪ × ৯

ঘ) ৭ × ৯ < ৮ × ৭

খোলা বাক্য (Open Sentence)

বাক্যটি লক্ষ্য করি। বাক্যটি কীরূপ? ☐ + ২২ = ৫৫

বাক্যটি সঠিক না ভুল বলা যাচ্ছে না। এটি সঠিক হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। এটি খোলা বাক্য। অর্থাৎ যে গাণিতিক বাক্য সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করা যায় না তাকে "খোলা বাক্য" বলে। বাক্যটি সঠিক না ভুল তা বলার জন্য বাক্যটিতে কী সংখ্যা ব্যবহার করা হবে তার উপর নির্ভর করতে হয়। অপরদিকে, যখন বাক্যটি সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করা যায় তখন ওই বাক্যটিকে "বদ্ধ বাক্য" বলা হয়। যেমন:

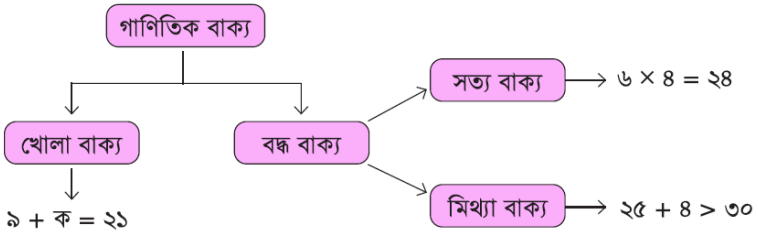

৫ একটি বিজোড় সংখ্যা	এটি একটি গাণিতিক বাক্য এবং এটি সত্য
১২ একটি বিজোড় সংখ্যা	এটি একটি গাণিতিক বাক্য এবং এটি মিথ্যা।
ক সংখ্যাটি ৫ দ্বারা বিভাজ্য	এটি একটি খোলা বাক্য, কারণ এটি সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে, যা ক এর মানের উপর নির্ভর করবে।

গাণিতিক বাক্য ও প্রতীক সম্পর্কিত সমস্যাঃ

ক) 'ক' কে অজানা সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করে নিচের বিবরণের গাণিতিক বাক্য লিখি এবং 'ক' এর মান নির্ণয় করি।

(১) একটি সংখ্যার সাথে ৬০ যোগ করলে যোগফল ১৯০ হয়।

(২) একটি সংখ্যাকে ৭ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল ৫ ও ভাগশেষ ৪ হয়।

খ) খালি ঘর সম্বলিত গাণিতিক বাক্য তৈরি করুন।

রেখার কাছে ২৪টি এবং রাজুর কাছে কিছু রঙিন পেন্সিল আছে। তাদের দুইজনের মোট ৩৭টি পেন্সিল থাকলে রাজুর কয়টি পেন্সিল আছে?

গ) নিচের খোলা বাক্যগুলোর অজানা মানগুলো বের করি যেন বাক্যগুলো সত্য হয়।

(১) দোকান থেকে 'ক' টাকার চাল কিনে ৫০০ টাকা দিয়ে ৮৫ টাকা ফেরত পেলাম।

(২) 'খ' সংখ্যক কলম ১২ জনের মধ্যে ৩টি করে ভাগ করে দেওয়া হলো।

গাণিতিক প্রতীক ও বাক্য শিখন শেখানো কৌশল

গাণিতিক প্রতীক ও বাক্য শেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো বাস্তব উদাহরণ, চিত্র, প্রতীক ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমকে একত্রে ব্যবহার করা। শিক্ষক প্রথমে বাস্তব বস্তু দিয়ে যোগ-বিয়োগের ধারণা দেবেন, যেমন বোতাম বা কাঠি ব্যবহার করে "মিলানো" বা "কমানো" দেখানো। এরপর শিক্ষার্থীরা যখন ধারণাটি বুঝে ফেলবে, তখন প্রতীক (+, −, =, >, <) উপস্থাপন করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা প্রতীকের অর্থ ও সম্পর্ক স্পষ্টভাবে ধরতে পারে। চিত্রভিত্তিক ব্যাখ্যা এই শিখনকে আরও দৃঢ় করবে। গাণিতিক প্রতীক ও বাক্য শেখানোর ধাপগুলো সহজ থেকে জটিল ক্রমে হওয়া উচিত।

যেমন: যোগ ⟶ বিয়োগ ⟶ তুলনা ⟶ গাণিতিক বাক্য গঠন।

এই পুরো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। দলগত কাজ, শিক্ষার্থীর নিজের উদাহরণ তৈরি করা এবং বোর্ডে উপস্থাপন করা শেখাকে সক্রিয় করে তোলে। ভুল হলে তাৎক্ষণিক শোধরানোর বদলে ভুলটি নিয়ে আলোচনা করলে শিক্ষার্থী ধারণাটি গভীরভাবে বুঝতে পারবে।

সংক্ষেপে শিক্ষক নিম্নের কৌশলগুলো ব্যবহার করতে পারেন:

- বাস্তব উপকরণ দিয়ে ধারণা তৈরি
- প্রতীকের অর্থ আগে, প্রতীক পরে দেখানো
- ছবি দেখে প্রতীকে রূপান্তর অনুশীলন
- সহজ থেকে জটিল ক্রমে শেখানো
- দলগত কাজ ও উদাহরণ তৈরি করা

গাণিতিক প্রতীক ও বাক্যের সঠিক ব্যবহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গাণিতিক ধারণা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষক হিসেবে, আমাদের দায়িত্ব হলো এই প্রতীকগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাণিতিক দক্ষতা, চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতা গড়ে তোলা। নিয়মিত অনুশীলন এবং গাণিতিক বাক্যের প্রয়োগে শিক্ষার্থীরা আরও আত্মবিশ্বাসী এবং দক্ষ হয়ে উঠবে।

অধ্যায় ৭
ভগ্নাংশ

ভগ্নাংশ গণিতের এমন একটি ধারণা, যা সম্পূর্ণ অংশকে সমান অংশে ভাগ করার মাধ্যমে পরিমাণকে বোঝাতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা যখন কোনো ফল, কেক বা কাগজকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে দেখে, তখন তারা সহজেই বুঝতে পারে যে প্রতিটি ভাগ পুরোটির একটি নির্দিষ্ট অংশ। এই অভিজ্ঞতা থেকেই ভগ্নাংশের ধারণা তৈরি হয়। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে ভগ্নাংশ শেখার সময় অনেকেই বিভ্রান্ত হয়, কারণ তারা এটিকে শুধু সংখ্যার রূপ মনে করে, পরিমাণের সম্পর্ক হিসেবে নয়। তাই ভগ্নাংশ শেখানো শুরু হওয়া উচিত পরিচিত ও বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে, যাতে শিক্ষার্থীরা অংশ ও সম্পূর্ণের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে ধরতে পারে।

ভগ্নাংশের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো দশমিক ভগ্নাংশ। দৈনন্দিন জীবনে আমরা টাকা-পয়সা, মাপজোক, লম্বা-চওড়া, ওজন কিংবা সময় পরিমাপ করতে গিয়ে প্রায়ই দশমিক সংখ্যার ব্যবহার দেখি। তাই দশমিক ভগ্নাংশ কী, কীভাবে লেখা হয়, কীভাবে পড়তে হয় এবং এর মান কীভাবে নির্ণয় করতে হয়, এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে বোঝা শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই প্রয়োজন। এছাড়া ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীর কাছে এটি প্রথমে জটিল মনে হয়। যেমন: হর, লব, সমহর, অসমহর। এসব ধারণা পরিষ্কারভাবে না বুঝলে তারা নিয়ম জানলেও সমস্যা সমাধানে আত্মবিশ্বাস পায় না। তাই শেখানোর সময় শুধু নিয়ম দেখিয়ে দেওয়া যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীরা যেন ভগ্নাংশকে বাস্তব জীবনের অংশ হিসেবে দেখতে পারে, সে জন্য চিত্র, হাতেকলমে কাজ এবং পরিস্থিতি-ভিত্তিক উদাহরণ ব্যবহার করা দরকার। এই অধ্যায়ে সাধারণ ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশের ধারণা, ভগ্নাংশ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান ও শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণ ভগ্নাংশ

যখন আমরা কোনো পূর্ণ বস্তুকে সমান অংশে ভাগ করি এবং তার এক বা একাধিক অংশ প্রকাশ করি, তখন সেটিকে ভগ্নাংশ বলা হয়। যেমন: একটি আপেলকে সমান ২ ভাগে ভাগ করলে এর ১ ভাগ হলো পুরো আপেলের ২ ভাগের ১ অংশ বা $\frac{১}{২}$ অংশ।

ভগ্নাংশ = $\frac{\text{লব}}{\text{হর}}$

এখানে হর বলতে বোঝায় পূর্ণ বস্তুটি কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আর লব বলতে বোঝায় সেই ভাগের কয়টি অংশ নেওয়া হয়েছে।

অনুশীলন:

১। নিচের প্রত্যেক আকৃতির রং করা অংশের পরিমাণ লিখি।

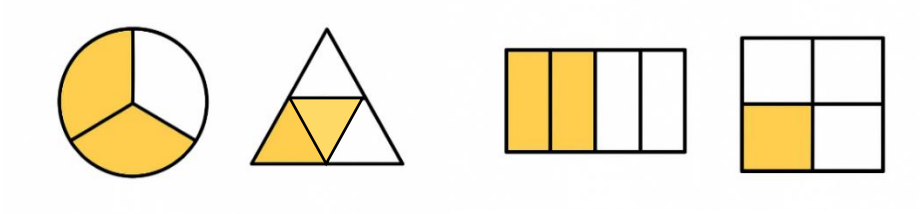

২। নিচের আকৃতিগুলোতে $\frac{৩}{৪}$ অংশ রং করি।

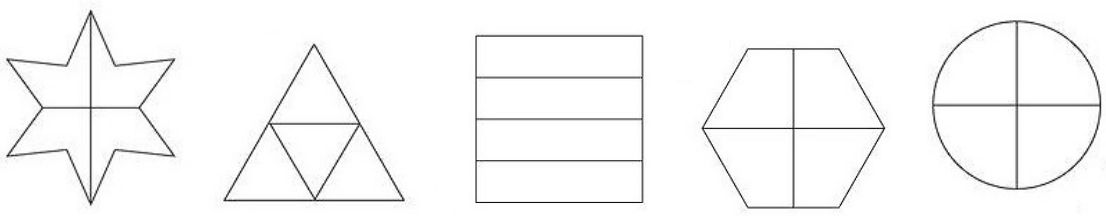

ভগ্নাংশের প্রকারভেদ

ভগ্নাংশ মূলত ৩ প্রকার- প্রকৃত, অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশ। নিচের ছকে এই ৩ প্রকার ভগ্নাংশের তুলনা আলোচনা করা হলো-

প্রকৃত ভগ্নাংশ	অপ্রকৃত ভগ্নাংশ	মিশ্র ভগ্নাংশ
যে ভগ্নাংশে লব হর থেকে ছোট থাকে তাকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে। এ ধরনের ভগ্নাংশের মান সবসময় ১ এর কম।	যে ভগ্নাংশে লব হরের সমান বা বড় থাকে তাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে। এর মান ১ বা ১ এর বেশি হতে পারে।	যে ভগ্নাংশে একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ থাকে তাকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলে। অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে রূপান্তর করে মিশ্র ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।
চেনার উপায়: • লব < হর • উপরের সংখ্যা (লব) নিচের সংখ্যার (হর) চেয়ে ছোট হবে।	**চেনার উপায়:** • লব ≥ হর • ভগ্নাংশের মান ১ বা ১-এর বেশি।	**চেনার উপায়:** • সামনে একটি পূর্ণসংখ্যা থাকবে • পাশে থাকবে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ
উদাহরণ: $\frac{২}{৫}, \frac{৩}{৮}, \frac{৭}{৯}$	**উদাহরণ:** $\frac{৫}{৪}, \frac{৭}{৩}, \frac{৯}{৯}$	**উদাহরণ:** $৩\frac{১}{৫}, ১\frac{২}{৩}, ২\frac{১}{৪}$

সমতুল ভগ্নাংশ

যে ভগ্নাংশগুলোর মান সমান সেগুলোকে সমতুল ভগ্নাংশ বলে। যেমন: $\frac{১}{২} = \frac{২}{৪} = \frac{৩}{৬} = \frac{৪}{৮} = \frac{৫}{১০}$

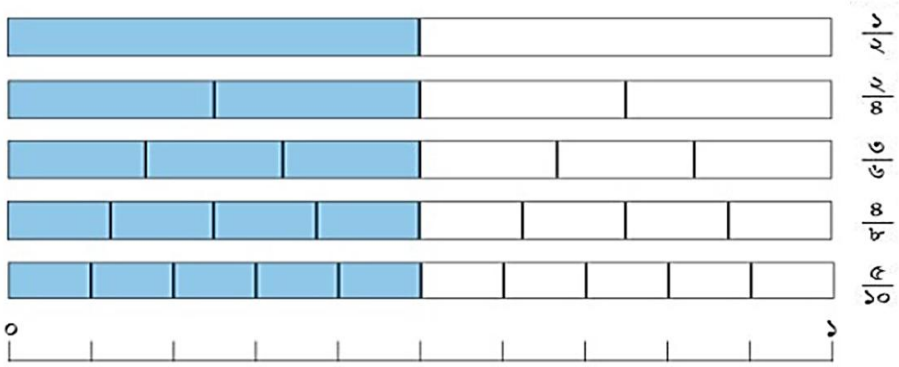

চিত্রটি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে ভগ্নাংশগুলো রয়েছে সেগুলোর মান সমান।

সমতুল ভগ্নাংশ খুঁজে বের করার সহজ পদ্ধতি হলো দুইটি ভগ্নাংশের লব ও হর পরস্পর গুণ করলে যদি গুণফল একই হয়, তবে ভগ্নাংশ দুইটি সমতুল হবে।

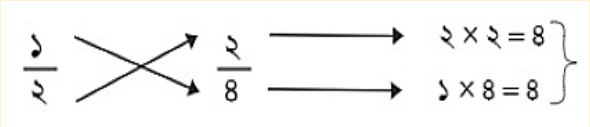

অনুশীলন:

১। নিচের খালি ঘরগুলো পূরণ করি।

(১) $\frac{৩}{৯} = \frac{\square}{৩}$ (২) $\frac{৬}{৮} = \frac{৩}{\square}$ (৩) $\frac{৪}{১২} = \frac{১}{\square}$ (৪) $\frac{৮}{২০} = \frac{\square}{৫}$

২। নিচের সংখ্যা রেখার উপরের খালি ঘরগুলো প্রকৃত ও অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং নিচের খালি ঘরগুলো মিশ্র ভগ্নাংশ দ্বারা পূরণ করি।

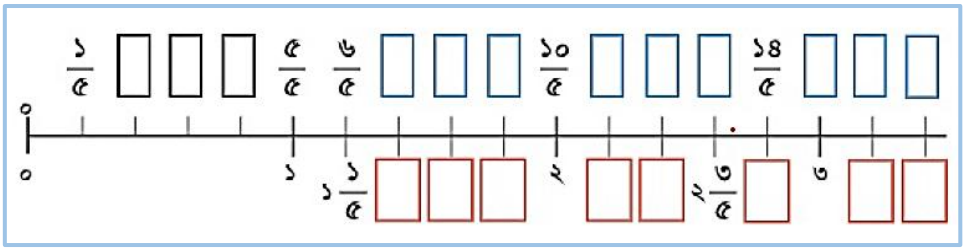

আনুপাতিক ভগ্নাংশ ও পরিমাণগত ভগ্নাংশ

আনুপাতিক ভগ্নাংশ কী?

যে ভগ্নাংশ দিয়ে কোনো দুটি বা একাধিক পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক বা অনুপাত বোঝানো হয় তাকে আনুপাতিক ভগ্নাংশ বলে। এটি কোনো অংশের মান নয়, বরং দুটি পরিমাণের তুলনা নির্দেশ করে।

যেমন, একটি ক্লাসে ছেলে ১২ জন, মেয়ে ৮ জন।

ছেলে : মেয়ে = ১২:৮ = $\frac{১২}{৮} = \frac{৩}{২}$

এখানে $\frac{৩}{২}$ হলো আনুপাতিক ভগ্নাংশ, কারণ এটি ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে তুলনামূলক সম্পর্ক দেখাচ্ছে।

এই ভগ্নাংশটি কোনো বাস্তব "অংশের মান" নির্দেশ করছে না, শুধুমাত্র ছেলে : মেয়ে = ৩ : ২ এই সম্পর্ক বোঝাচ্ছে।

পরিমাণগত ভগ্নাংশ কী?

যে ভগ্নাংশ কোনো একটি মোট পরিমাণের নির্দিষ্ট অংশকে নির্দেশ করে তাকে পরিমাণগত ভগ্নাংশ বলে। এটি বাস্তব কোনো অংশ বা অংশবিশেষ নির্দেশ করে।

যেমন: একটি কেককে ৮ ভাগ করা হলো। তুমি খেয়েছ ৩ ভাগ। তাহলে তুমি খেয়েছো = $\frac{৩}{৮}$ অংশ।

এখানে $\frac{৩}{৮}$ হলো পরিমাণগত ভগ্নাংশ, কারণ এটি মোট কেকের বাস্তব অংশ (৮ ভাগের মধ্যে ৩ ভাগ) বোঝাচ্ছে। এই ভগ্নাংশটি বাস্তবে কতটুকু অংশ নেওয়া হয়েছে সেটি স্পষ্টভাবে বোঝায়।

উদাহরণ

গ্লাসের মধ্যে ৫ ভাগের ২ ভাগ পানি আছে। বালতির মধ্যে ৫ ভাগের ১ ভাগ পানি আছে। রহিম বলে যে ৫ ভাগের ২ এবং ৫ ভাগের ১ করে মোট ৫ ভাগের ৩ হবে।

রহিমের ধারণায় কী ভুল রয়েছে? কেন?

সমাধান

এ প্রশ্নটি আনুপাতিক ভগ্নাংশের প্রশ্ন।

যদি পাত্রগুলোর আকার ভিন্ন হয় তাহলে ৫ ভাগের ২ ভাগ অথবা ৫ ভাগের ১ ভাগ এর পরিমাণও ভিন্ন হবে। এক্ষেত্রে এদুটিকে এভাবে সোজাসুজি যোগ করে ভগ্নাংশের মান সমান করা যাবে না।

সাধারণ ভগ্নাংশ শিখন শেখানো কৌশল

শিক্ষার্থীরা ভগ্নাংশকে সবচেয়ে ভালো বুঝে বাস্তব বস্তু, ছবি, ও গল্পের মাধ্যমে। নিচে কার্যকর কিছু কৌশল দেওয়া হলো।

১। বাস্তব বস্তু ব্যবহার করা।

- কাগজ, ককশিট, কাঠি এগুলোকে সমান ভাগে কেটে দেখানো।
- শিক্ষার্থীদের দিয়ে কোনো কিছু বাস্তবে ভাগ করে দেখানো যায়। এই অভিজ্ঞতাই তাদের ভগ্নাংশের মূল ধারণা গঠনে সাহায্য করবে। যেমন-

রঙিন কাগজ দিয়ে বৃত্ত বা স্ট্রিপ বানিয়ে ২, ৩, ৪, ৮ বিভিন্ন ভাগ করে দেখানো। প্রতিটি ভাগ আলাদাভাবে শিক্ষার্থীদের রং করতে দেয়া যায়। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করা-"রঙ করা অংশের পরিমাণ কত?

২। বোর্ডে চিত্র/ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সমান ভাগ করে দেখিয়ে লব হরের সম্পর্ক বোঝানো।

৩। খেলা বা দলগত কাজ করতে দেয়া।

- "ভগ্নাংশ ম্যাচিং কার্ড" যেখানে সবাই ছবি ও ভগ্নাংশ মিলিয়ে দেখাবে।
- দল ভাগ করে সমান অংশ খুঁজে বের করতে দিয়ে ছোট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়।

৪। দৈনন্দিন জীবনের উদাহরণ দেয়া।

- অর্ধেক গ্লাস পানি, তিন-চতুর্থাংশ রাস্তা হাঁটা, দুই-তৃতীয়াংশ রুটি খাওয়া এভাবে বাস্তব জীবনের উদাহরণ ভগ্নাংশকে সহজ করে তোলে।

দশমিক ভগ্নাংশ

দশমিক ভগ্নাংশ হলো এমন ভগ্নাংশ যেখানে হর ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি হয় এবং এগুলোকে দশমিক বিন্দু ব্যবহার করে লেখা হয়। অর্থাৎ যে ভগ্নাংশের হর (নিচের সংখ্যা) ১০, ১০০, ১০০০ ... এই ধরনের সংখ্যার সমান হয়, তাকে দশমিক ভগ্নাংশ বলা হয়। দৈনন্দিন জীবনে দশমিক ভগ্নাংশের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে।

যেমন: রাফির কাছে ১টি চকোলেট বার আছে। সে বারটি বন্ধুকে দিতে গিয়ে দেখে বারটি ১০টি সমান অংশে ভাগ করা। রাফি ৩টি অংশ খেয়ে ফেলল। এখন রাফি কীভাবে বলবে সে কতখানি খেয়েছে? ভগ্নাংশে বলা যায় রাফি $\frac{৩}{১০}$ অংশ খেয়েছে। আবার রাফি ০.৩ অংশ খেয়েছে এটিও বলা যায়। এই ধরনের ভগ্নাংশই দশমিক ভগ্নাংশ।

- $\frac{৩}{১০} = ০.৩$
- $\frac{২৫}{১০০} = ০.২৫$

দশমিক ভগ্নাংশ সাধারণ ভগ্নাংশকে সহজে পড়তে ও গণনা করতে সাহায্য করে।

উদাহরণ: ৩২.৬ সংখ্যাটির মধ্যে ৬ এর মান কত? বা "৬" কী প্রকাশ করছে?

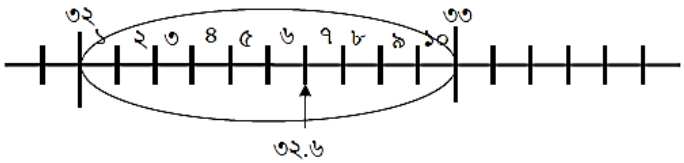

উপরের সংখ্যারেখায় ৩২ থেকে ৩৩ এর মধ্যে ১০টি ভাগ করা হয়েছে। এটি হলো ১০টি ভাগের ৬টি অংশ। এটিকে "দশমিক ছয়" "০.৬" হিসেবে লেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, দশমিক ভগ্নাংশ হলো সাধারণ ভগ্নাংশের একটি বিশেষ রূপ। এজন্য কোন কিছুর পরিমাণকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই ওই পরিমাণের $\frac{১}{১০}$ ব্যবহার করে থাকি।

যেমন: ১ লিটারের $\frac{১}{১০}$ অংশ আয়তনকে **'০.১ লিটার'** বলে এবং একে কথায় **'শুন্য দশমিক এক লিটার'** পড়া হয়। ০.১, ০.৪, ৩.৪ ইত্যাদিকে আমরা দশমিক সংখ্যা এবং '.' কে আমরা দশমিক বিন্দু বলি এবং দশমিক বিন্দুর ডানপাশের অঙ্কের স্থানকে দশমাংশ বলা হয়।

দশমিক ভগ্নাংশের স্থানীয় মান

দশমিক ভগ্নাংশের **স্থানীয় মান** বলতে বোঝায় দশমিক বিন্দুর ডানদিকে থাকা প্রতিটি অঙ্কের মান তার অবস্থান অনুযায়ী কোন ভগ্নাংশকে প্রকাশ করছে। পূর্ণ সংখ্যার স্থানীয় মান একক, দশক, শতক ইত্যাদি নামে পরিচিত। দশমিক ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম দিক থেকে ডান দিকের স্থানগুলোকে দশমাংশ, শতাংশ, সহস্রাংশ ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে এবং একক স্থানের ডানে একটি বিন্দু (.) বসিয়ে পূর্ণ সংখ্যা এবং দশমিকাংশ পৃথকভাবে চেনা যায়। এ বিন্দুটিকে বলা হয় দশমিক বিন্দু। দশমিক ভগ্নাংশের দশমাংশ, শতাংশ, সহস্রাংশ ইত্যাদি স্থানগুলোর মান যথাক্রমে ০.১, ০.০১. ০.০০১ ইত্যাদি লিখে প্রকাশ করা হয়। যেমন,

একটি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় একজন দৌড়বিদ ৪২.১৯৫ কিমি পথ দৌড়ান। এখানে ৪২.১৯৫ সংখ্যাটি একটি দশমিক ভগ্নাংশ। সংখ্যাটির স্থানীয় মানগুলো কত?

স্থানের নাম	দশক	একক	দশমাংশ	শতাংশ	সহস্রাংশ
একক	১০	১	০.১	০.০১	০.০০১
সংখ্যা	৪	২	১	৯	৫

দশমিকের বাম পাশ ⟶ পূর্ণ সংখ্যা
দশমিকের ডান পাশ ⟶ ভগ্নাংশের অংশ

দশমিকের ডান দিকে প্রথম ঘর = **দশমাংশ** $(\frac{১}{১০})$

দ্বিতীয় ঘর = **শতাংশ** $(\frac{১}{১০০})$

তৃতীয় ঘর = **সহস্রাংশ** $(\frac{১}{১০০০})$

উদাহরণ:

১। ৪.৩৫৮ সংখ্যাটির স্থানীয় মানগুলো কত?

অঙ্ক	স্থানের নাম	স্থানীয় মান
৪	একক	৪
৩	দশমাংশ	$৩ \times \frac{১}{১০} = ০.৩$
৫	শতাংশ	$৫ \times \frac{১}{১০০} = ০.০৫$
৮	সহস্রাংশ	$৮ \times \frac{১}{১০০০} = ০.০০৮$

অর্থাৎ, ৪.৩৫৮ = ৪ + ০.৩ + ০.০৫ + ০.০০৮

২। ১ মিটার কাপড়ের মূল্য ১৮০ টাকা। ২.৫ মিটার কাপড়ের মূল্য কত?

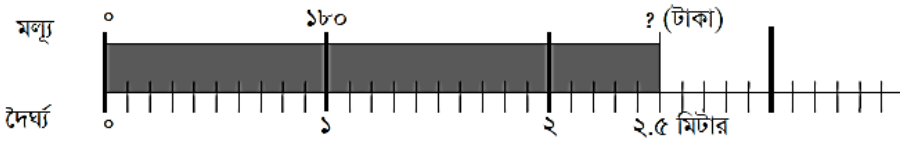

সমাধান

১ মিটার কাপড়ের মূল্য ১৮০ টাকা। ২.৫ মিটার কাপড়ের মূল্য ১৮০×২.৫ ঢাকা = ৪৫০ টাকা।

৪৫০ টাকা ২.৫ মিটার কাপড়ের মূল্য ৪৫০ টাকা প্রকাশ করে। অর্থাৎ, এখানে ক্রয়কৃত সম্পূর্ণ কাপড়ের মূল্য প্রকাশ করেছে।

দশমিক ভগ্নাংশ সম্পর্কিত সমস্যা

১) ০.৮ কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করি

২) ১৮০×৩.৪ গুণটি দ্বারা একটি গাণিতিক সমস্যা তৈরি করি এবং সমাধান করি।

৩) রেজার ওজন ৩৬.৫ কেজি, তার ছোট ভাই এবং বাবার ওজন যথাক্রমে তার ওজনের ০.৮ গুণ এবং ১.৬ গুণ। তার ভাই এবং বাবার ওজন নির্ণয় কর।

দশমিক ভগ্নাংশ শিখন শেখানো কৌশল

দশমিক ভগ্নাংশ গণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা শিক্ষার্থীদের পরিমাপ, টাকা-পয়সা, দৈর্ঘ্য, ওজনসহ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সমাধানে সক্ষম করে। ভগ্নাংশের ধারণা স্পষ্ট না হলে যেমন গণিতের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দুর্বলতা দেখা দেয়, তেমনি দশমিক ভগ্নাংশ না বোঝা শিক্ষার্থীদের গণনা, তুলনা, ও প্রয়োগভিত্তিক সমস্যার সমাধানে জটিলতা সৃষ্টি করে। তাই শ্রেণিকক্ষে দশমিক ভগ্নাংশ এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা চিত্র, বাস্তব উদাহরণ, স্থানমান, এবং হাতে–কলমে কার্যক্রমের মাধ্যমে সহজে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। উপযুক্ত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা শুধু দশমিক সংখ্যা বুঝতেই পারবে না; বরং তা ব্যবহার করে বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে ভগ্নাংশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে বিবেচনা করে দশমিক ভগ্নাংশ শিখনের জন্য নিম্নরূপ কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে-

১) বাস্তব উদাহরণ দিয়ে শুরু করা। যেমন:

- টাকার হিসাব (১ টাকা = ১০০ পয়সা ⟶ ০.৫০ = ৫০ পয়সা)
- দৈর্ঘ্য (১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার ⟶ ০.২৫ মিটার)
- ওজন (০.৭৫ কেজি) এসব ব্যবহার করলে ধারণা খুব দ্রুত পরিষ্কার হয়।

২) চিত্রভিত্তিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা। যেমন:

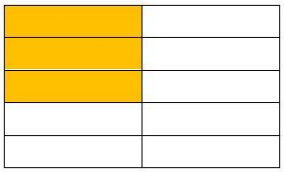

- শতকরা গ্রিড (১০০ এর গ্রিড) ব্যবহার
- দশভাগ করা কাগজের স্ট্রিপ বা বৃত্ত ব্যবহার
- রঙিন ব্লক বা স্কয়ার ভাগ করে দশমিক দেখানো। যেমন: ০.৩ দেখাতে ১০টি ঘরের মধ্যে ৩টি রঙ করা।

৩) ভগ্নাংশ ও দশমিকের সম্পর্ক পরিষ্কার করা। যেমন:

- ১/১০ = ০.১
- ৭/১০ = ০.৭
- ২৫/১০০ = ০.২৫ এভাবে ভাগফল বের করে দশমিক রূপ দেখানো। ভগ্নাংশকে দশমিক ও দশমিককে ভগ্নাংশে রূপান্তর দেখানো।

৫) হাতে কলমে কার্যক্রম করানো। যেমন:

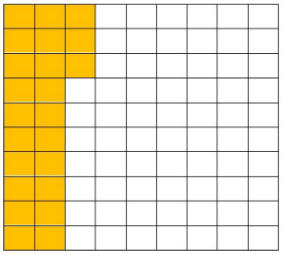

- শিক্ষার্থীদের ১০০ ঘরে মধ্যে ০.২৩ অংশ রঙ করা বা ২৩টি ঘর রঙ করা এভাবে বোঝানো
- টেপ/কাগজ কেটে ১০ সমান ভাগ করে ০.৪ বা ০.৬ দেখানো।
- গ্রুপওয়ার্কে দশমিক সংখ্যা সাজানো।

হাতে কলমে কার্যক্রমে একটি উদাহরণ দেখি-

শিক্ষার্থীদেরকে স্কেল দিয়ে তাদের চারপাশের ছোটখাট জিনিস যেমন, রাবার, পেনসিল, তাদের আঙ্গুল ইত্যাদি মেপে খাতায় লিখতে বলি। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বস্তুগুলোর দৈর্ঘ্য কীভাবে মাপছে এবং খাতায় লিখছে তা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করি। শিক্ষার্থীরা হয়ত বস্তুগুলো মাপতে পারবে কিন্তু লিখে প্রকাশ করতে সমস্যায় পড়বে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা ডানপাশে দেখানো চিত্রের ন্যায় একটি রাবার মেপে থাকে তবে তারা হয়তো বলবে-

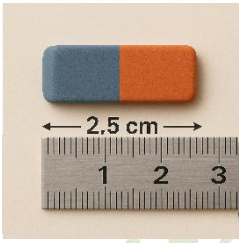

- এটি ২ সে.মি. থেকে লম্বা কিন্তু ৩ সে.মি. থেকে খাট।
- এটি প্রায় আড়াই সেন্টিমিটার লম্বা।
- আমরা এটার মাপ বলতে পারছি না।" বা অন্য কিছু।

- শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের ভিতরের এবং বাইরের বিভিন্ন বস্তু মাপতে উৎসাহিত করা এবং তাদের খাতায় লিখতে বলা।

শিক্ষার্থীদের স্কেলের ছোট দাগগুলোর প্রতি লক্ষ করতে বলুন এবং জিজ্ঞেস করুন,
"১ সেন্টিমিটারকে কয়টি সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে?" ১ সেন্টিমিটারকে ১০ টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এ উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য তাদের দাগগুলো গণনা করতে নির্দেশ দিন।
সবাইকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করুন যেন, একটি বস্তু আরও সুনির্দিষ্টভাবে মাপা যায় যদি আমরা স্কেলের ছোট ছোট দাগ ব্যবহার করি। এবার তাদের আরেকটি বস্তু মাপতে দিন এবং ছোট দাগগুলো পড়তে দিন। উদাহরণস্বরূপ, উপরে দেওয়া উদাহরণে রাবারটির দৈর্ঘ্য ২ সেন্টিমিটার এবং ৫টি ছোট দাগ"।

এজন্য তাদের বলা, একে আমরা "দুই দশমিক ৫ সেন্টিমিটার" হিসেবে পড়ি এবং ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন "২.৫ সেন্টিমিটার"। শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন। লক্ষ করুন কীভাবে শিক্ষার্থীরা উত্তর দিচ্ছে, যদি ভুল উত্তর দিয়ে থাকে তবে তা সংশোধন করে দিন। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা বলে "২৫ সেন্টিমিটার" তবে বলা, এটা হবে "২.৫ সেন্টিমিটার"।

একইভাবে অন্যান্য বস্তু যেমন, চক, পেন্সিল, পাথর ইত্যাদি মাপতে সহায়তা করুন এবং সতর্কতার সাথে লক্ষ করুন, তারা কীভাবে বস্তুগুলো পরিমাপ করছে। শিক্ষার্থীদের তাদের মাপগুলো অন্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলতে দিন। লক্ষ করুন তারা দশমিক ভগ্নাংশগুলো সঠিকভাবে বলছে কিনা।

ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ

সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ

উদাহরণ: জাহিদের গণিত বিষয়ের বাড়ির কাজ করতে সময় লাগে $\frac{২}{৫}$ ঘন্টা এবং ইংরেজি বিষয়ের বাড়ির কাজ করতে সময় লাগে $\frac{৩}{৫}$ ঘণ্টা। এই দুই বিষয়ের বাড়ির কাজ করতে তার কত ঘণ্টা সময় লাগে?

$$\frac{২}{৫} + \frac{৩}{৫} = \frac{৫}{৫} = ১$$

এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে যে কয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে-

ধাপ ১: হর একই আছে কিনা দেখে নিতে হবে।

ধাপ ২: লব যোগ বা বিয়োগ করা; এক্ষেত্রে হর অপরিবর্তিত থাকবে।

ধাপ ৩: প্রয়োজন হলে সরলীকরণ (সাধারণ ভাগ) করা।

অর্থাৎ যখন আমরা সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ বা বিয়োগ করব, যোগফলের হর হবে ভগ্নাংশগুলোর সাধারণ হর এবং লব হবে ভগ্নাংশের লবগুলোর যোগফল বা বিয়োগফল।

অসমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ

উদাহরণ: তোমার কাছে $\frac{২}{৩}$ লিটার দুধ রয়েছে যা তুমি $\frac{১}{৪}$ লিটার দুধ পান করেছ। আর কত লিটার দুধ অবশিষ্ট রয়েছে?

$$= \frac{২}{৩} - \frac{১}{৪}$$
$$= \frac{৮}{১২} - \frac{৩}{১২}$$
$$= \frac{৫}{১২}$$

এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে যে কয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে-

ধাপ ১: দুই হরের লসাগু নির্ণয় করে নিতে হবে।

ধাপ ২: প্রতিটি ভগ্নাংশকে সেই লসাগুর ভিত্তিতে সমপর্যায়ের ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে হবে (হর ও লব একই সংখ্যা দ্বারা গুণ)।

ধাপ ৩: নতুন লবগুলো যোগ বা বিয়োগ করতে হবে। হর হবে ল.সা.গু।

ধাপ ৪: প্রয়োজন হলে সরলীকরণ (সাধারণ ভাগ) করা।

এ থেকে বোঝা যায়, ভিন্ন হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশসমূহে যোগ অথবা বিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রথমে ভগ্নাংশগুলোকে সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে রুপান্তর করে তারপর হিসাব করতে হবে।

মিশ্র ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ

উদাহরণ: দুটি ৫ লিটার পানির পাত্রের একটিতে $৩\frac{১}{৫}$ লিটার এবং অপরটিতে $২\frac{৩}{৫}$ লিটার পানি আছে। দুটি পাত্রে একত্রে কত লিটার পানি আছে?

$$৩\frac{১}{৫} + ২\frac{৩}{৫}$$

$$= \frac{৩ \times ৫ + ১}{৫} + \frac{২ \times ৫ + ৩}{৫}$$

$$= \frac{১৬}{৫} + \frac{১৩}{৫}$$

$$= \frac{২৯}{৫}$$

$$= ৫\frac{৪}{৫}$$

এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে যে কয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে-

ধাপ ১: মিশ্র ভগ্নাংশ হলে প্রথমে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করা।

$$\frac{\text{পূর্ণ} \times \text{হর} + \text{লব}}{\text{হর}}$$

ধাপ ২: হরগুলোর লসাগু নির্ণয় করে নিতে হবে।

ধাপ ৩: প্রতিটি ভগ্নাংশকে সেই লসাগুর ভিত্তিতে সমপর্যায়ের ভগ্নাংশেরূপান্তর করতে হবে (হর ও লব একই সংখ্যা দ্বারা গুণ)।

ধাপ ৪: নতুন লবগুলো যোগ বা বিয়োগ করতে হবে। হর হবে লসাগু।

ধাপ ৫: প্রয়োজন হলে আবার মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর ও সরলীকরণ (সাধারণ ভাগ) করা।

ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ: শিখন শেখানো কৌশল

১. ভগ্নাংশ শেখানোর পূর্বশর্ত হলো শিক্ষার্থীদের একক, লব ও হর, সমহর ও অসমহর, প্রকৃত ও অপ্রকৃত, ভগ্নাংশ সম্পর্কিত শব্দ, সংখ্যা হিসেবে ভগ্নাংশ এবং ভগ্নাংশের মানের তুলনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা থাকতে হবে। এজন্য এই ধারনা গুলো প্রথমে ভালভাবে দিয়ে নিতে হবে।

২. বিভিন্ন চিত্র ব্যবহার করা ব্যবহার করা। যেমন: বৃত্ত, বার, গ্রিড

এসব ব্যবহার করে যোগ-বিয়োগের প্রতিটি ধাপ চিত্রে দেখালে শিক্ষার্থীরা দ্রুত বুঝতে পারবে। যেমন:

- $\frac{১}{৪} + \frac{২}{৪} \longrightarrow$ একটি বার-এ রঙ করে দেখানো
- $\frac{৩}{৮} - \frac{১}{৮} \longrightarrow$ একই বৃত্তে অংশ কেটে দেখানো

৩. বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করা। যেমন: পিজ্জা ভাগ, চকলেট বক্স, মিটার ফিতা, টাকা-পয়সা, রুটি, আপেল

এসব দিয়ে যোগ-বিয়োগের সমস্যা দিলে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝবে।

- সময় বা দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত ভগ্নাংশ ব্যবহার করা।
- গল্পভিত্তিক সমস্যা দিলে শিশু বেশি মনোযোগ দেয়।

৪. হাতে কলমে কাজ করানো। যেমন:

- রঙিন কাগজ কেটে ভগ্নাংশ তৈরি করতে দেয়া
- ভগ্নাংশ কার্ড বা গ্রিড রঙ করে ভিন্ন দুটি ভগ্নাংশ যোগ বা বিয়োগ করতে শেখানো

অধ্যায় ৮
গুণিতক ও গুণনীয়ক

লসাগু (Lowest Common Multiple-LCM) ও গসাগু (Highest Common Factor-HCF) গণিতের মৌলিক ধারণাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধারণা। বিভিন্ন গাণিতিক এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে সংখ্যার বিভাজ্যতা, গুণনীয়ক ও গুণিতক এবং এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা একান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরে এই বিষয়গুলো শেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরবর্তী উচ্চতর গণিত শিক্ষার জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়। এ সব ধারণাকে সুস্পষ্ট করার জন্য সাধারণ গুণনীয়ক, সাধারণ গুণিতক, লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক এবং গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক সম্পর্কে ধারণাও অপরিহার্য। লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (লসাগু) গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গসাগু) গণিতের এমন একটি ভিত্তি যা সঠিকভাবে শেখানো গেলে শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষায় নয়, জীবনের বাস্তব সমস্যাও সহজে বুঝতে ও সমাধান করতে পারে। শিক্ষকগণ যদি বাস্তব উদাহরণ, চিত্র, গল্প ও ধাপে ধাপে পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তবে এ ধারণা শিশুরা খুব স্বাভাবিকভাবে আয়ত্ত করতে পারবে। পরবর্তী দুটি পাঠে লসাগু ও গসাগু কি? এবং কিভাবে লসাগু ও গসাগু নির্ণয় করা হয় ও সম্যস্যা সমাধানে এর প্রয়োগ হয় তা আলোচনা করা হয়েছে।

গুণিতক

একজন শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থীকে ৩ টি করে রঙিন কাগজ দিতে চান। তার মোট কতগুলো কাগজ লাগবে?

শিক্ষকের মোট কয়টি কাগজ লাগবে তা নিচের ছক অনুসারে খুঁজে বের করি

শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কাগজের সংখ্যা	৩	৬	৯	১২					

প্রতি শিক্ষার্থীকে ৩ টি করে কাগজ দিলে ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩৩,..... সংখ্যক কাগজ লাগবে। ৩ কে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করার মাধ্যমে ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩৩,..... সংখ্যগুলো গঠিত হয়েছে। গঠিত সংখ্যাগুলোকে ৩ এর গুণিতক বলে। ৩ এর গুণিতকগুলো ৩ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
কোনো সংখ্যার গুণিতক হলো ঐ সংখ্যার সাথে যেকোনো পূর্ণ সংখ্যার গুণফল।

নিচের সংখ্যারেখা থেকে ৩, ৪ ও ৬ এর গুণিতক গুলো বৃত্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করি (কয়েকটি করে দেখানো হলো)।

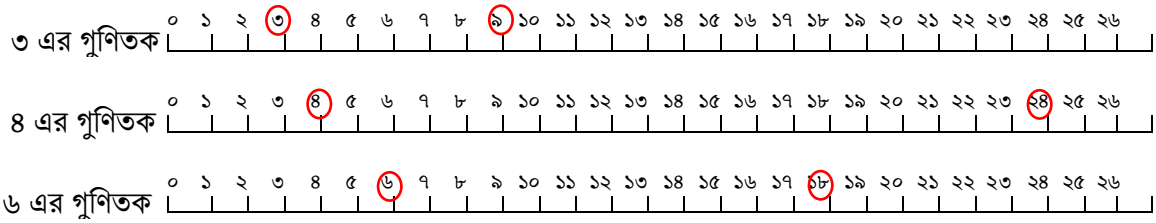

সাধারণ গুণিতক: প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর যতগুলো গুণিতক হয় তাদের মধ্যে যে যে গুণিতক প্রত্যেক সংখ্যার গুণিতকের মধ্যে থাকে তাদের বলা হয় ঐ সংখ্যাগুলোর সাধারণ গুণিতক।

৩ এর গুণিতক হচ্ছে- ৩, ৬, ৯,১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৩৯, ৪২,.....।
৪ এর গুণিতক হচ্ছে- ৪, ৮, ১২, ১৬, ২০, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪৪, ৪৮,৫২, ৫৬, ...।
৬ এর গুণিতক হচ্ছে- ৬, ১২, ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৫৪, ৬০, ৬৬, ৭২,৭৮, ৮৪, ...।

৩, ৪, ৬ এর সাধারণ গুণিতক-১২, ২৪, ৩৬..... এবং ৩, ৪ ও ৬ এর সবচেয়ে ছোট অর্থাৎ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা লসাগু হলো ১২।

লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (লসাগু): একাধিক সংখ্যার অসংখ্য সাধারণ গুণিতকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট সাধারণ গুণিতকই হলো লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক, সংক্ষেপে যাকে আমরা লসাগু বলি। লসাগু নির্ণয় করার উপরোক্ত পদ্ধতিকে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলা হয়।

লসাগু নির্ণয়ের পদ্ধতি

ক. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
খ. মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ পদ্ধতি
গ. ইউক্লিডীয় পদ্ধতি

ক. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

উদাহরণ: ৬, ৮, ১২ এর লসাগু নির্ণয় করি।
৬ এর গুণিতকগুলো হচ্ছে -৬, ১২, ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৫৪, ৬০, ৬৬, ৭২,.....।
৮ এর গুণিতকগুলো হচ্ছে- ৮, ১৬, ২৪, ৩২, ৪০, ৪৮, ৫৬, ৬৪, ৭২,.....।
১২ এর গুণিতক গুলো হচ্ছে- ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮, ৬০, ৭২,.....।
পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ৬, ৮ এবং ১২ এর সাধারণ গুণিতক হচ্ছে ২৪, ৪৮, ৭২.....।
এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বা লঘিষ্ঠ গুণিতক হচ্ছে ২৪।
সুতরাং ৬, ৮ এবং ১২ এর নির্ণেয় লসাগু ২৪।

খ) মৌলিক উৎপাদক পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে যেসব সংখ্যার লসাগু বের করতে হবে প্রথমে তাদের মৌলিক উৎপাদক বের করতে হবে। অতঃপর সংখ্যাগুলোর সর্বাধিক একই সাধারণ (common) মৌলিক উৎপাদক এবং সাধারণ নয় (Uncommon) এমন মৌলিক উৎপাদকের গুণফলই হবে সংখ্যাগুলোর লসাগু।

উদাহরণ: ১৬ ও ২৪ এর লসাগু নির্ণয় করি।
১৬ = ২ × ৮ = ২ × ২ × ৪ = ২ × ২ × ২ × ২
২৪ = ২ × ১২ = ২ × ২ × ৬ = ২ × ২ × ২ × ৩

অর্থাৎ,
১৬ এবং ২৪ এর সর্বাধিক সাধারণ উৎপাদকগুলো ২, ২, ও ২
১৬ এবং ২৪ এর সাধারণ নয় (অন্যান্য) উৎপাদক ২ ও ৩
১৬ এবং ২৪ এর লসাগু ২ × ২ × ২ × ২ × ৩ = ৮ × ৬ = ৪৮

গ) ইউক্লিডীয় পদ্ধতি

এ পদ্ধতি লসাগু নির্ণয়ের সর্বাধিক ব্যবহৃত সহজ পদ্ধতি। সংখ্যাগুলোকে একই লাইনে সাজাতে হবে। অতঃপর মৌলিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে যাতে একাধিক সংখ্যা একই সংগে নিঃশেষে ভাগ করা যায়। ভাগ শেষে ভাগফল এবং অবিভাজ্য সংখ্যাগুলো দ্বিতীয় লাইনে লিখতে হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে ভাগ করে যেতে হবে। ভাগ করতে করতে যখন ভাগফল এবং অবিভাজ্য সংখ্যাগুলো কেবল মাত্র পরস্পর সহমৌলিক থাকবে তখন ভাগ বন্ধ করতে হবে। অতঃপর ভাজকগুলো এবং সহমৌলিক ভাগফল ও অবিভাজ্য সংখ্যাগুলোর ধারাবাহিক গুণ করতে হবে। এভাবে প্রাপ্ত গুণফলই হবে প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর নির্ণেয় লসাগু।

উদাহরণ: ১৮, ২৪, ৪০ এবং ৬০ এর লসাগু নির্ণয়।

২ | ১৮, ২৪, ৪০, ৬০
২ | ৯, ১২, ২০, ৩০
২ | ৯, ৬, ১০, ১৫
৩ | ৯, ৩, ৫, ১৫
৫ | ৩, ১, ৫, ৫
৩, ১, ১, ১

নির্ণেয় লসাগু = ২ × ২ × ২ × ৩ × ৫ × ৩ = ৩৬০

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়

(১) প্রদত্ত ৪টি সংখ্যা ২ দ্বারা বিভাজ্য তাই এদের কমা চিহ্ন দিয়ে পৃথক করে লিখে ২ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। ভাগফলগুলো নিচে নিচে বসানো হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় ধাপের সংখ্যাগুলো ২ দ্বারা বিভাজ্য তাই এদেরও ২ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে এবং ভাগফলগুলো নিচে নিচে বসানো হয়েছে।

(৩) তৃতীয় ধাপের কমপক্ষে২টি সংখ্যা ২ দ্বারা বিভাজ্য তাই এদের ২ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে, ভাগফলগুলো নিচে নিচে বসানো হয়েছে কিন্তু যেটি বিভাজ্য নয় সেটি অপরিবর্তিত হয়ে নিচে বসেছে।

(৪) চতুর্থ ধাপের ২টি সংখ্যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য তাই এদের ৩ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। ভাগফলগুলো এবং অবিভাজ্য সংখ্যা আগের মতো নিচে বসেছে। এভাবে একসময় এমন সংখ্যা পাওয়া গেছে যা ১ অথবা সহ মৌলিক।

(৫) এবার ভাজক গুলো এবং অবশেষগুলো পরপর সাজিয়ে গুণ করা হয়েছে। গুণফলটি নির্ণেয় লসাগু। পদ্ধতিটি ইউক্লিড কর্তৃক উদ্ভাবিত বলে একে ইউক্লিডীয় পদ্ধতি বলে।

উদাহরণ: মহাখালি বাস টার্মিনাল থেকে সকাল ৮টায় ময়মনসিংহ ও বগুড়াগামী দুইটি কোম্পানীর বাস একসঙ্গে ছাড়ল। ময়মনসিংহ ও বগুড়াগামী বাসগুলো যথাক্রমে ৪ মিনিট ও ৬ মিনিট পরপর ছাড়ে। উক্ত দুইটি কোম্পানীর বাস ন্যূনতম কতক্ষণ পর আবার একসঙ্গে ছাড়বে?

ছবি চতুর্থ শ্রেণির গণিত বই পৃষ্ঠা-৩৬

সমাধান, বাস দুটি সকাল ৮টায় একত্রে ছাড়ার পর পরবর্তী একত্রে ছাড়ার সময় হবে ৪, ৬ সংখ্যা দুটির লসাগু। নিচের ছকের সাহায্যে সমস্যাটি উপস্থাপন করা হলো।

ময়মনসিংহগামী বাস ৪মিনিট পরপর	৮:০০	৮:০৪	৮:০৮	৮:১২	৮:১৬	৮:২০	৮:২৪	৮:২৮	৮:৩২	৮:৩৬	
বগুড়াগামী বাস ৬মিনিট পরপর	৮:০০	৮:০৬	৮:১২	৮:১৮	৮:২৪	৮:৩০	৮:৩৬	৮:৪২	৮:৪৮	৮:৫৪	

উপরের ছক হতে দেখা যায় বাস দুটি সকাল ৮:০০ টায় একত্রে ছাড়ার পর পরবর্তী ৮:১২, ৮:২৪, ৮:৩৬ সময়ে একত্রে ছাড়বে। অর্থাৎবাস দুটি ন্যূনতম একত্রে ছাড়ার সময় ৮:১২ টায়।

লসাগু সম্পর্কিত সমস্যা

১. একটি টাইলসের দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৫ ইঞ্চি। এ টাইলস দ্বারা একটি বর্গ তৈরি করলে বর্গের ক্ষুদ্রতম বাহুটি কত ইঞ্চি হবে?

২.২টি ঘণ্টার মধ্যে একটি প্রতি ১০ সেকেন্ড পর এবং আরেকটি প্রতি ৩০ সেকেন্ড পরে বাজে। ঘণ্টা দুটি একই সময়ে বাজালে পরবতী কত সেকেন্ড পরে পুনরায় একসাথে বাজবে?

গুণনীয়ক

শিক্ষক ১৬ টি কাগজ কতজন শিক্ষার্থীকে সমানভাবে ভাগ করে দিতে পারবেন? নিম্নের ছকে সমাধান চেষ্টা করি।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
হাতে না রেখে:√	√	√		√				√								√
হাতে না রেখে:×			×		×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	

অর্থাৎ ১৬ টি কাগজ ১জন, ২জন, ৪জন, ৮জন অথবা ১৬ জনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া যাবে।

যে সকল সংখ্যা দ্বারা ১৬ কে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকেনা সেগুলো হলো ১৬ এর গুণনীয়ক।

১৬ এর গুণনীয়কগুলো হলো- ১, ২, ৪, ৮, এবং ১৬। কোনো সংখ্যার গুণনীয়গুলোর মধ্যে সবসময় ১ এবং ঐ সংখ্যা থাকে।

অর্থাৎ একটি সংখ্যা দ্বারা অপর একটি সংখ্যা নিঃশেষে বিভাজ্য হলে প্রথম সংখ্যাটিকে দ্বিতীয় সংখ্যার গুণনীয়ক বলে। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, একটি সংখ্যাকে যতগুলো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় এর সবগুলোই ঐ সংখ্যার গুণনীয়ক।

নিচের সংখ্যাগুলোর গুণনীয়কগুলো বৃত্তাকারে চিহ্নিত করি-

৯ এর গুণনীয়ক - ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
১২ এর গুণনীয়ক - ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
১৭ এর গুণনীয়ক - ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
২০ এর গুণনীয়ক - ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
২৪ এর গুণনীয়ক - ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

মৌলিক গুণনীয়ক:

কোন সংখ্যার যে সকল গুণনীয়ক মৌলিক সংখ্যা ঐ সকল গুণনীয়ককে মৌলিক গুণনীয়ক বা মৌলিক উৎপাদক বলা হয়। যেমন: ২৪ এর গুণনীয়ক হলো ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪ এখানে ২ ও ৩ মৌলিক সংখ্যা। সুতরাং ২ ও ৩ মৌলিক গুণনীয়ক বা উৎপাদক।

প্রকৃত গুণনীয়ক

কোনো যৌগিক সংখ্যার ১ এবং সে সংখ্যা ব্যতীত অন্যান্য গুণনীয়ককে সে সংখ্যার প্রকৃত গুণনীয়ক বলে। অর্থাৎ কোন যৌগিক সংখ্যার প্রকৃত গুণনীয়ক হবে ১ এবং সে সংখ্যাটি ছাড়া বাকী গুণনীয়কগুলো, যেমন, ৬ একটি যৌগিক সংখ্যা। ৬ এর গুণনীয়ক ১, ২, ৩ এবং ৬। ৬ এর প্রকৃত গুণনীয়ক হচ্ছে ২ এবং ৩। অনুরূপভাবে ১৫ এর প্রকৃত গুণনীয়ক ৩ এবং ৫। মৌলিক সংখ্যার কোন প্রকৃত গুণনীয়ক নেই। একটি সংখ্যার প্রকৃত গুণনীয়ক, সংখ্যাটির অর্ধেকের চেয়ে বড় হবে না।

সাধারণ গুণনীয়ক:

কোন সংখ্যা একাধিক সংখ্যার গুণনীয়ক হলে ঐ সংখ্যাকে উক্ত সংখ্যাগুলোর সাধারণ গুণনীয়ক বলে।

উদাহরণ:

১৬ এর গুণনীয়ক – ১, ২, ৪, ৮, ১৬

৩৬ এর গুণনীয়ক – ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৯, ১২, ১৮, ৩৬

১৬ এবং ৩৬ এর সাধারণ গুণনীয়ক -১, ২ ও ৪

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গসাগু):

একাধিক সংখ্যার গুণনীয়কের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাধারণ গুণনীয়কই হলো গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক সংক্ষেপ গসাগু। অর্থাৎ ১৬ এবং ৩৬ এর গসাগু ৪।

গসাগু নির্ণয়ের পদ্ধতি ক. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
খ. উৎপাদক পদ্ধতি
গ. ইউক্লিডীয় পদ্ধতি

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে প্রথমে সংখ্যাগুলোর গুণনীয়কগুলো বের করে নিতে হবে। অতঃপর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি সংখ্যার গুণনীয়কগুলো হতে সর্ববৃহৎ সাধারণ গুণনীয়কটি চিহ্নিত করতে হবে। এ সর্ববৃহৎ সাধারণ গুণনীয়কই হবে নির্ণেয় গসাগু।

যেমন, ১৬ এবং ২৪ এর গসাগু নির্ণয় করি।

১৬ এর গুণনীয়ক - ১, ২, ৪, ৮, ১৬

২৪ এর গুণনীয়ক - ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২, ২৪।

১৬ ও ২৪ এর সাধারণ গুণনীয়ক - ১, ২, ৪, ৮।

সুতরাং ১৬ ও ২৪ এর গসাগু হলো ৮।

উৎপাদক পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে প্রথমে সংখ্যাগুলোর মৌলিক উৎপাদক বের করে নিতে হবে। অতঃপর সংখ্যাগুলোর সাধারণ মৌলিক উৎপাদকগুলো চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত সাধারণ উৎপাদক কিংবা উৎপাদকগুলোর গুণফলই হবে সংখ্যাগুলোর নির্ণেয় গসাগু।

যেমন, ১৮, ২৪, ও ৩০ এর গসাগু -

১৮ = ২ × ৩ × ৩

২৪ = ২ × ৩ × ২ × ২

৩০ = ২ × ৩ × ৫

এখানে ১৮, ২৪ ও ৩০ এর সাধারণ মৌলিক উৎপাদক ২ এবং ৩।

সুতরাং ১৮, ২৪ ও ৩০ এর নির্ণেয় গসাগু = ২×৩ = ৬।

ইউক্লিডীয় পদ্ধতি

এ পদ্ধতিকে প্রচলিত ভাগ পদ্ধতিও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে যদি দুইটি সংখ্যার গসাগু বের করতে বলা হয় তবে প্রথমে বড় সংখ্যাকে ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে অবশিষ্ট বের করতে হবে। অতঃপর অবশিষ্টকে ভাজক ধরে পূর্বোক্ত ভাজককে ভাজ্য ধরে ভাগ করে অবশিষ্ট বের করতে হবে। এভাবে এগুতে হবে যতক্ষণ না নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। নিঃশেষে বিভাজ্য ধাপের ভাজক বা শেষ ভাজকই হবে সংখ্যা দুইটির গসাগু।

যেমন: ১৫ এবং ২৫ এর গসাগু-

১৫)২৫(১
<u>১৫</u>
১০)১৫(১
<u>১০</u>
৫)১০(২
<u>১০</u>
০

এখানে ভাগের সর্বশেষ ধাপে ভাজক ৫

সুতরাং ১৫ এবং ২৫ এ নির্ণেয় গসাগু = ৫।

যদি সংখ্যা দুইটি না হয়ে ততোধিক হয় তবে প্রথমে সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় সাজিয়ে নিতে হবে অতঃপর প্রথম ধাপে, প্রথম দুইটি সংখ্যার ভাগ পদ্ধতিতে গসাগু নির্ণয় করতে হবে। প্রথম ধাপের নির্ণেয় গসাগু এর সাথে তৃতীয় সংখ্যার গসাগু নির্ণয় করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে গসাগু হবে প্রথম তিনটি সংখ্যার গসাগু। যদি ৪টি সংখ্যার গসাগু নির্ণয় করতে হয় তবে ক্রমশ উক্ত নিয়মে অগ্রসর হয়ে তৃতীয় ধাপে, দ্বিতীয় ধাপে নির্ণেয় গসাগু এর সাথে গসাগু নির্ণয় করতে হবে এবং এই গসাগু হবে ৪টি সংখ্যার নির্ণেয় গসাগু। ৪ এর অধিক সংখ্যার গসাগু নির্ণয় করতে ক্রমশ উক্ত নিয়মে অগ্রসর হয়ে গসাগু নির্ণয় করলেই সংখ্যাগুলোর গসাগু পাওয়া যাবে।

যেমন: ১৮, ৩৬ ও ৮১ এর গসাগু নির্ণয় করি।

প্রথম ধাপ: ১৮ ও ৩৬ এর গসাগু।	দ্বিতীয় ধাপ: ১৮ এবং৮১ এর গসাগু।
১৮)৩৬ (২ <u>৩৬</u> ০ ১৮ ও ৩৬ এর গসাগু ১৮	১৮) ৮১ (৪ <u>৭২</u> ৯) ১৮ (২ <u>১৮</u> ০ ∴ ১৮ এবং ৮১ এর গসাগু= ৯

সুতরাং ১৮, ৩৬ ও ৮১ এর গসাগু = ৯

উদাহরণ: গ্রীষ্মের ছুটিতে রেজাদের বাসায় তার কয়েকজন সহপাঠী বেড়াতে আসল। তাদের বাসায় ১৬টি কলা ও ১২টি লিচু আছে। কলা ও লিচুগুলো সর্বোচ্চ কতজন সহপাঠীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে পারবে?

সমাধান, যদি সহপাঠীর সংখ্যা ২ জন হয় প্রত্যেককে ৮টি করে কলা এবং ৬টি করে লিচু দেওয়া যাবে। কিন্তু সর্বোচ্চ কত জন সহপাঠীকে ১৬টি কলা ও ১২লিচু সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে তা আমরা নিচের ছকের সাহায্যে দেখি।

সহপাঠীর সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৬টি	☑	☑	✗	☑	✗	✗	✗	√	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	√
১২টি	☑	☑	√	☑	✗	√	✗	✗	✗	✗	✗	√	✗	✗	✗	✗

১২ এর গুণনীয়ক- ১, ২, ৩, ৪, ১২

১৬ এর গুণনীয়ক- ১, ২, ৪, ৮, ১৬

১২ এবং ১৬ উভয়েরই গুণনীয়ক হলো – ১, ২, ৪

সুতরাং ১২ ও ১৬ এর গসাগু হলো ৪।
অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে কলা ও লিচু সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে।

গসাগু সম্পর্কিত সমস্যা

১.তিনটি ভিন্ন রং এর ঘণ্টা আছে। লাল রং এর ঘণ্টা ১৮ মিনিট পরপর, হলুদ রং এর ঘণ্টা ১৫ মিনিট পরপর এবং সবুজ রং এর ঘণ্টা ১২ মিনিট পরপর বাজে। ঘণ্টাগুলো সন্ধ্যা ৬টায় একসাথে বাজলে, পুনরায় কখন একসাথে বাজবে?
২.কোনো স্থানে ১০ জনের বেশি শিক্ষার্থী আছে। একজন শিক্ষক ৪২টি কলা, ৮৪টি বিস্কুট এবং ১০৫টি চকলেট কোনো অবশিষ্ট না রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিতে চান। কতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষক কলা, বিস্কুট এবং চকলেট ভাগ করে দিতে পারবেন?

পরামর্শ: উপরোল্লেখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর পাশাপাশি প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে।

অধ্যায় ৯
শতকরা ও গড়

শতকরা (Percentage) গণিতের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা দৈনন্দিন জীবন থেকে উচ্চশিক্ষা সব জায়গায় ব্যবহৃত হয়। ফলাফল বিশ্লেষণ, ডিসকাউন্ট, সুদ, লাভ-ক্ষতি, জরিপের ফল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মান তুলনা ও বিশ্লেষণের জন্য শতকরা ব্যবহার করা হয়। তাই শতকরা শুধুমাত্র একটি গণিতের অধ্যায় নয়; বরং শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও বাস্তব জীবনভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম।

ঠিক একইভাবে গণিত শিক্ষায় গড় (Average/Mean) এমন একটি মৌলিক ধারণা, যা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিশ্লেষণ, তুলনা ও বাস্তব জীবনের তথ্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভিত্তি তৈরি করে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেমন গড় নম্বর, গড় তাপমাত্রা, গড় গতি বা গড় ব্যয় নির্ণয় করি। এসব ক্ষেত্রে গড় ব্যবহৃত হয় একটি সাধারণ বা মধ্যবর্তী মান হিসেবে। ফলে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে গড়ের ধারণা স্বাভাবিকভাবে সম্পর্কিত। তবে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা গড় নির্ণয়ের ধাপ, যুক্তি এবং সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বা সমান বণ্টনের ধারণা ঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই গড় শেখানোর সময় প্রয়োজন সঠিক উদাহরণ, চিত্রভিত্তিক উপস্থাপন, ধাপে ধাপে নির্দেশনা এবং বিশ্লেষণধর্মী অনুশীলন। এই অধ্যায়ে গড় ও শতকরার মৌলিক ধারণা, এর ব্যবহার, শিক্ষাদানের কার্যকর কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শতকরা

শতকরা (Percentage) মানে হলো "প্রতি ১০০ অংশের কত অংশ"। অর্থাৎ,
শতকরা = ভগ্নাংশকে ১০০ অংশের ভিত্তিতে প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি

শতকরা (%) = (অংশ / পূর্ণমান) × ১০০

পাশের ক্ষেত্রটি কতটি ছোট ছোট ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে? কতটি ঘর রং করা হয়েছে? রং করা ঘরগুলো বড় ক্ষেত্রটির কত অংশ? ভগ্নাংশটিতে হর কত? একে শতকরায় কিভাবে লেখা হয়?

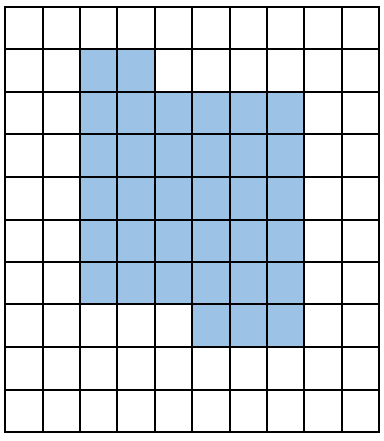

পাশের বড় ক্ষেত্রটি ১০০টি ছোট ক্ষেত্রে বা ঘরে ভাগকরা হয়েছে। এই একশত ঘরের মধ্যে ৩৫টি ঘর রং করা হয়েছে। তা হলে দেখা যায়,

রং করা ঘরগুলো বড় ক্ষেত্রটির $\frac{৩৫}{১০০}$ অংশ।

$\frac{৩৫}{১০০}$ ভগ্নাংশটিতে হর হলো ১০০।

ভগ্নাংশটিকে পড়া হয় প্রতি শতে ৩৫ বা শতকরা ৩৫। একে শতকরায় লেখা হয় ৩৫%। '%' প্রতীকটি হচ্ছে শতকরার প্রতীক।

উদাহরণ: একটি বিদ্যালয়ে একদিন ১ম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪২ জন উপস্থিত ছিল। আর ২য় শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ জন উপস্থিত ছিল। কোন শ্রেণিতে উপস্থিতির শতকরা হার বেশি?

সমাধান

- উপস্থিতি (ভগ্নাংশে): ১ম শ্রেণিতে $\frac{৪২}{৬০}$ অংশ এবং ২য় শ্রেণিতে $\frac{৩৫}{৫০}$ অংশ

➢ শতকরায় রূপান্তর করলে ১ম শ্রেণিতে $\frac{৪২}{৬০} = \frac{৪২\times১০০}{৬০\times১০০} = \frac{৪২০০}{৬০} \times \frac{১}{১০০} = ৭০\%$

২য় শ্রেণিতে $\frac{৩৫}{৫০} = \frac{৩৫\times১০০}{৫০\times১০০} = \frac{৩৫০০}{৫০} \times \frac{১}{১০০} = ৭০\%$

তাহলে দুই শ্রেণিতেই উপস্থিতির হার সমান ৭০%। ভগ্নাংশ হিসেবে দেখলেও সমান হয়: $\frac{৪২}{৬০} = \frac{৭}{১০}$ এবং $\frac{৩৫}{৫০} = \frac{৭}{১০}$

সুতরাং, দুটো শ্রেণিতেই উপস্থিতির শতকরা হার সমান, ৭০%।

শতকরা হলো এমন একটি ভগ্নাংশ যার হর ১০০, এরূপ ভগ্নাংশকে শতকরা প্রতীক "%" দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যায়, ভগ্নাংশের হর ১০০ করা হলে লবের মান থেকে জানা যায় ১০০ এর মধ্যে কত অংশ। '%' প্রতীক দিয়ে $\frac{১}{১০০}$ কে নির্দেশ করে। তাহলে $১\% = \frac{১}{১০০} = ০.০১$ একইভাবে $২\% = ২ \times \frac{১}{১০০} = \frac{২}{১০০} = ০.০২$

উদাহরণ: জসিম একটি ব্যাংকে ৭% বার্ষিক মুনাফায় ২ বছরের জন্য ২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। ২ বছর পর জসিম কত টাকা মুনাফা পাবেন?

সমাধান:

১০০ টাকায় ১ বছরে মুনাফা ৭ টাকা

১ ,, ১ ,, ,, $\frac{৭}{১০০}$

২০০০০ ,, ১ ,, ,, $\frac{৭ \times ২০০০০}{১০০}$

২০০০০ ,, ২ ,, ,, $\frac{৭ \times ২০০০০ \times ২}{১০০}$

তাহলে আমরা বলতে পারি-

মুনাফা = আসল × সময় × মুনাফার হার

$= \boxed{২০০০০ \times ২ \times \frac{৭}{১০০}} = ২৮০০$ টাকা

উদাহরণ: তপন একটি কারখানা থেকে একটি মেশিন ক্রয় করে ১৫% লাভে মেশিনটি ৫৫২০০ টাকায় বিক্রয় করলেন। মেশিনটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান:

১৫% লাভে বিক্রয় অর্থ ১০০ টাকায় লাভ ১৫ টাকা। অর্থাৎ

ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ১০০ + ১৫ = ১১৫ টাকা। তাহলে-

১১৫ টাকা বিক্রয়মূল্য হলে ক্রয়মূল্য হয় ১০০ টাকা

১ ,, ,, ,, ,, ,, $\frac{১০০}{১১৫}$

৫৫২০০ ,, ,, ,, ,, ,, $\frac{১০০ \times ৫৫২০০}{১১৫} = ৪৮০০০$ টাকা

অর্থাৎ মেশিনটির ক্রয়মূল্য ৪৮০০০ টাকা

শতকরা সম্পর্কিত সমস্যা:

১। হোসেনের মাসিক আয় ২,৫০০ টাকা এবং তার মধ্য থেকে তিনি ১,৭৫০ টাকা খাবার কেনায় ব্যয় করেন। শামিমের মাসিক আয় ১,৮০০ টাকা এবং তিনি খাবার কেনায় ১,৪৪০ টাকা ব্যয় করেন।

(ক) তাদের প্রত্যেকের আয়ের ওপর খাবার কেনার ব্যয় শতকরায় প্রকাশ করি।

(খ) কে খাবার কেনায় আনুপাতিকভাবে বেশি টাকা ব্যয় করেন?

২। শফিক সাহেব একটি ব্যাংক থেকে ৪৫০০ টাকা ঋণ নিলেন। বার্ষিক ৮% মুনাফা আসলের উপর ধার্য করা হলো।

(১) ১০ বছর পর মোট কত টাকা পরিশোধ করতে হবে?

(২) কত বছর পর মোট মুনাফার পরিমাণ ২৫২০ টাকা হবে?

৩। শতকরা সম্পর্কিত একটি সমস্যা তৈরি করি।

শতকরা শিখন শেখানো কৌশল

শতকরা বিষয়বস্তুটি ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশের সাথে সম্পর্কিত। তাই শিক্ষার্থীর ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করে শতকরার ধারণা প্রদান করতে হবে। তাছাড়া বাস্তব উপকরণের ব্যবহার এবং চিত্রে শতকরা প্রকাশ শিক্ষার্থীর শতকরার ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। এজন্য নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করা যায়-

- ✓ ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা।
- ✓ বাস্তব উদাহরণ দিয়ে শতকরা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করা।
- ✓ বিষয়বস্তু চিত্রভিত্তিক উপস্থাপন করা। যেমন, ১০০ গ্রিডের ঘর বা পাই চার্ট।
- ✓ ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান করতে শেখানো।
- ✓ শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনধর্মী কার্যক্রম করানো। যেমন, দলে ভাগ করে "দোকানের Discount পোস্টার" বানিয়ে নতুন সমস্যা তৈরি ও সমাধান করতে দেওয়া (যেমন ১০%, ১৫%, ২৫% ছাড়) অথবা শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উচ্চতা, ফলাফল, উপস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে শতকরা হিসাব করতে দেওয়া।

গড়

গড় হলো একটি পরিসংখ্যানগত মান, যা একটি সংখ্যাগুচ্ছের কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে বোঝায়। সহজভাবে বলতে গেলে-

$$\text{গড়} = \frac{\text{সব সংখ্যার যোগফল}}{\text{মোট সংখ্যা}}$$

এটি একটি দল বা সেটের সাধারণ মান, সাধারণ অবস্থা বা মাঝামাঝি অবস্থাকে নির্দেশ করে।

যেমন, নিম্নের প্রশ্নটির উত্তর চিন্তা করি;

ডান পাশের চিত্রের অনুরূপ ৩টি পাত্রে কমলার জুস রাখা হলো। ৩টি পাত্রের জুস সমান করতে চাইলে আমদেরকে কী করতে হবে?

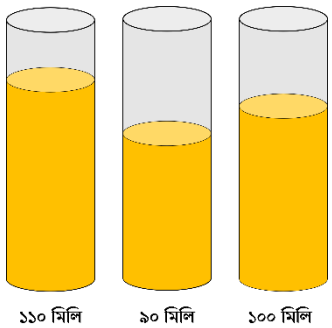

যদি আমরা ৩টি পাত্রের জুস একটি পাত্রে রাখি, তাহলে হবে-

(৯০+ ১০০+১১০) মিলি = ৩০০ মিলি

সুতরাং ১টি পাত্রে জুসের পরিমাণ হবে, (৩০০ ÷ ৩) মিলি = ১০০ মিলি

উদাহরণ: নিচে ৫ জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা দেয়া আছে-

নাম	লিমা	তুষার	শিউলী	সবুজ	কনক
উচ্চতা (সেমি)	১৩৩	১৪২	১৪৫	১৪৯	১৫২

উচ্চতাগুলোর গড় হলো: (১৩৩ + ১৪২ + ১৪৫ + ১৪৯ + ১৫২) ÷ ৫ = ১৪৪.২ সেমি

আমরা কী অন্য কোন পদ্ধতিতে সহজে গড় নির্ণয় করতে পারি?

কৌশল-১

যেহেতু উপরের তালিকায় প্রত্যেকের উচ্চতার মান ১৩০ সেমি থেকে বড়, তাই ১৩০ সেমি থেকে পার্থক্য নির্ণয় শুরু করা যায়, আর মানগুলো হলো: ৩ সেমি, ১২ সেমি, ১৫ সেমি, ১৯ সেমি ও ২২ সেমি

তারপর মানগুলোর গড় নির্ণয় করি-

(৩ + ১২ + ১৫ + ১৯ + ২২) ÷ ৫ = ১৪.২ সেমি

পরিশেষে ১৩০ সেমি এর সাথে ১৪.২ সেমি যোগ করি-

১৩০ + ১৪.২ = ১৪৪.২ সেমি

অর্থাৎ উচ্চতাগুলোর গড় হলো ১৪৪.২ সেমি

কৌশল-২

যেহেতু উপরের তালিকায় উচ্চতার সর্বনিম্ন মান ১৩৩ সেমি, তাই ১৩৩ সেমি থেকে পার্থক্য নির্ণয় শুরু করা যায়, আর মানগুলো হলো: ০ সেমি, ৯ সেমি, ১২ সেমি, ১৬ সেমি ও ১৯ সেমি

তারপর মানগুলোর গড় নির্ণয় করি-

(০ + ৯ + ১২ + ১৬ + ১৯) ÷ ৫ = ১১.২ সেমি

পরিশেষে ১৩৩ সেমি এর সাথে ১১.২ সেমি যোগ করি-

১৩৩ + ১১.২ = ১৪৪.২ সেমি

অর্থাৎ উচ্চতাগুলোর গড় হলো ১৪৪.২ সেমি

কেন গড় শেখানো জরুরি?

- বাস্তব জীবনের সমস্যায় গড় খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। যেমন: ফলাফল, তাপমাত্রা, গতি ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীরা সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক বোঝে।
- পরিসংখ্যান, বিজ্ঞান ও গণিতে পরবর্তী ভিত্তি তৈরি করে।
- তুলনা করার দক্ষতা বাড়ে।

গড় সম্পর্কিত সমস্যা

১। একটি শ্রেণিতে ২০ জন শিক্ষার্থীর বয়সের গড় ১০ বছর। শ্রেণিতে আরো ১০ জন শিক্ষার্থী নতুন ভর্তি হওয়ায় বয়সের গড় ১ বছর বৃদ্ধি পায়। তাহলে নতুন শিক্ষার্থীদের বয়সের গড় কত?

২। নিচের ছকে ৫ জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা দেয়া হলো:

নাম	সবুজ	রাখি	মকবুল	সামিয়া	রিতা
উচ্চতা (সেমি)	১৪২	১৪৪	১৩৭	১৪৬	১৪১

(ক) শিক্ষার্থীদের গড় উচ্চতা কত?

(খ) সবচেয়ে বেশি উচ্চতার ২ জন শিক্ষার্থীর গড় কত?

(গ) সবচেয়ে বেশি উচ্চতার ২ জন এবং সবচেয়ে কম উচ্চতার ২ জন শিক্ষার্থীর গড়ের পার্থক্য কত?

৩। একজন ক্রিকেটারের ১৫টি ইনিংসের গড় রান ৩১.৭৫। পরবর্তী ৩টি ইনিংসে সে যদি ১০৮, ৩৪ এবং ৪৭ রান করে তবে তার গড় রান কত হবে?

গড় শিখন শেখানো কৌশল

গড় শেখানোর ক্ষেত্রে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের মৌলিক ধারণা পরিষ্কার করতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে গড় হলো সংখ্যাগুলোর সমান বণ্টিত মান। এ জন্য শিক্ষক বাস্তব উদাহরণ- যেমন প্রাপ্ত নম্বর, বয়স বা তাপমাত্রা, ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা ধারণাটি সহজে ধরতে পারবে। পাশাপাশি ভিজ্যুয়াল উপকরণ অত্যন্ত কার্যকর; তাই কাঠি, মার্বেল, ব্লক ব্যবহার করে সমান বণ্টনের ধারণা দেখানো যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের বোঝার সুবিধার জন্য বার-চার্ট বা ব্লক মডেলও ব্যবহার করা যায়, যেখানে প্রতিটি সংখ্যাকে বার হিসেবে দেখিয়ে পরবর্তীতে সেগুলো সমান করলে যে মান পাওয়া যায় সেটিই গড়। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। যেমন-

- সব সংখ্যা যোগ করো
- মোট উপাদানের সংখ্যা বের করো
- ভাগ করে ফলাফল লেখো
- প্রয়োজন হলে দশমিক মান হিসাব করো

এছাড়া দৈনন্দিন জীবনের সাথে গড়ের সম্পর্ক দেখালে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ে, যেমন এক সপ্তাহের গড় তাপমাত্রা নির্ণয় বা পাঁচ দিনের হাঁটার গড় দূরত্ব নির্ণয়। গড় শেখানোর সময় ভুল ধারণা দূরীকরণও গুরুত্বপূর্ণ; যেমন- সবচেয়ে বড় বা ছোট সংখ্যাই গড় নয়, বরং প্রতিটি সংখ্যা গড়ের ওপর প্রভাব ফেলে। শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে গ্রুপওয়ার্ক, তথ্য সংগ্রহ এবং বাস্তব ডেটা বিশ্লেষণভিত্তিক কার্যক্রম ব্যবহার করা যেতে পারে, যা গড়ের ধারণাকে আরও স্পষ্ট ও স্থায়ীভাবে শেখায়।

অধ্যায় ১০
পরিমাপ

সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষ পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পরিমাপের প্রক্রিয়া অনুমান নির্ভর হলেও ক্রমান্বয়ে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষ নির্ভুল পরিমাপের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। এর ফলে আমরা আধুনিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ ব্যবহার করতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজেই পরিমাপের প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন ঘর তৈরিতে মেঝে, দরজা বা জানালার মাপ নিতে দৈর্ঘ্য জানতে হয়, বাজারে শাকসবজি বা চাল কিনতে হলে ওজন জানতে হয়, পানি, দুধ বা তেল ব্যবহারে আয়তন পরিমাপ অপরিহার্য, আর সময় পরিমাপ তো আমাদের সারাদিনের প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন হয়।

প্রাথমিক স্তরে পরিমাপ শেখানো মানে কেবল সংখ্যার হিসাব শেখানো নয়, বরং এটি শিশুদের পরিমাপ সম্পর্কে বাস্তবজীবনের ধারণা, প্রয়োগের দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের মানসিকতা গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিশুরা যখন বাস্তব উপকরণ হাতে নিয়ে মাপজোকের কাজ করে, তখন তারা শিখতে পারে কীভাবে গণিত বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অধ্যায়ে দৈর্ঘ্য, ওজন, আয়তন, সময় ও ক্ষেত্রফল পরিমাপ এবং এর শিখন শেখানো কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরিমাপের একক

পরিমাপ হলো কোনো বস্তুর আকার, পরিমাণ, মাত্রা বা কোনো ঘটনার সময়কে নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করার একটি বৈজ্ঞানিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। কোনো কিছু পরিমাপ করতে একটি একই ধরনের মাপের আদর্শ প্রয়োজন, যার সাথে সমস্ত বস্তু বা রাশির তুলনা করা হয়। এই আদর্শ পরিমাপকে ঐ জাতীয় মাপের একক বলা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিমাপের বিভিন্ন একক ব্যবহৃত হয়। যেমন, দৈর্ঘ্য মাপতে ফুট, গজ, ইঞ্চি, মিটার, সেন্টিমিটার, হাত, বিঘত ইত্যাদি বিভিন্ন এককের প্রচলন রয়েছে। এভাবে ওজন, আয়তন, ক্ষেত্রফল পরিমাপের ভিন্ন ভিন্ন একক রয়েছে। তবে বর্তমানে সারাবিশ্বে একই প্রকার পরিমাপের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে একটি মাত্র একক ব্যবহারের প্রক্রিয়া প্রচলিত হয়েছে যার নাম আন্তর্জাতিক পরিমাপ পদ্ধতি বা System International (SI)।

এস আই (SI) পদ্ধতিতে পরিমাপের একক সমূহ:

দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক	-	মিটার
ওজন পরিমাপের একক	-	কিলোগ্রাম বা কেজি
আয়তন পরিমাপের একক	-	ঘনমিটার বা লিটার
সময় পরিমাপের একক	-	সেকেন্ড
ক্ষেত্রফল পরিমাপের একক	-	বর্গমিটার

দৈর্ঘ্য পরিমাপ

দৈর্ঘ্য পরিমাপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দৈর্ঘ্য বলতে কোনো বস্তুর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্বকে বোঝায়। বাস্তব জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত দৈর্ঘ্য পরিমাপ ব্যবহার করি। উদাহরণ হিসেবে, যদি বলা হয়—"একটি বেঞ্চের দৈর্ঘ্য ১.৫ মিটার", তাহলে এর অর্থ হলো বেঞ্চটির দৈর্ঘ্য ১ মিটার দূরত্বের সঙ্গে তুলনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ১ মিটারের ১.৫ গুণ। এখানে মিটার হলো দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক, এবং ১.৫ হলো সেই বস্তুর প্রকৃত দৈর্ঘ্যের পরিমাণ।

দৈর্ঘ্য পরিমাপের বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্ক

দৈর্ঘ্যের এককসমূহ

বড়ো ↑	১ কিলোমিটার (কিমি)	=	১০০০	মি
	১ হেক্টোমিটার (হেমি)	=	১০০	মি
	১ ডেকামিটার (ডেকামি)	=	১০	মি
	১ মিটার (মি)	=	১	মি
	১ ডেসিমিটার (ডেসিমি)	=	০.১	মি বা $\frac{১}{১০}$ মি
ছোটো ↓	১ সেন্টিমিটার (সেমি)	=	০.০১	মি বা $\frac{১}{১০০}$ মি
	১ মিলিমিটার (মিমি)	=	০.০০১	মি বা $\frac{১}{১০০০}$ মি

দৈর্ঘ্য পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যা

১। শ্রেণিকক্ষের দরজা, জানালা ও হোয়াইট বোর্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি ও মিটারে প্রকাশ করি

বস্তু	দৈর্ঘ্য (মিটার ও সেন্টিমিটারে)	দৈর্ঘ্য (মিটারে)
দরজা	..... মি ..... সেমি	..... মি
জানালা	..... মি ..... সেমি	..... মি
হোয়াইট বোর্ড	..... মি ..... সেমি	..... মি

২। চিত্রটি দেখি ও নিচের সমস্যাগুলোর সমাধান করি

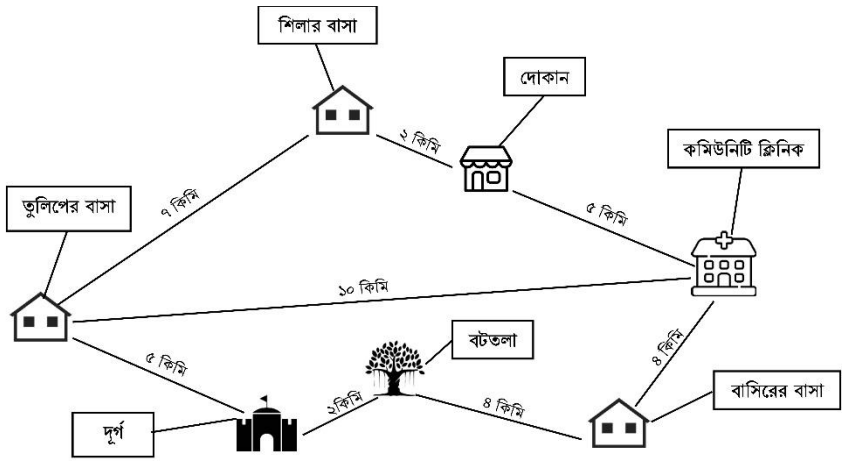

ক. শিলার বাসা থেকে দুর্গের দূরত্ব কত হেক্টোমিটার?

খ. তুলিপ বটতলা হয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকে যেতে চাইলে সরাসরি যাওয়ার চাইতে কত মিটার কম বা বেশি পথ যেতে হবে?

গ. বাসির সাইকেল চালিয়ে ১ ঘন্টায় দোকানে যেতে চায়। তাহলে তাকে প্রতি মিনিটে গড়ে কত মিটার পথ অতিক্রম করতে হবে?

ঘ. তুলিপ প্রতি মিনিটে ৭৫ মিটার এবং শিলা প্রতি মিনিটে ৬০ মিটার পথ যেতে পারে। একই সময়ে রওয়ানা দিলে তাদের মধ্যে কে আগে কমিউনিটি ক্লিনিকে পৌঁছাবে?

৩। উপরের চিত্রটি অনুসারে দৈর্ঘ্য পরিমাপ সম্পর্কিত ২টি সমস্যা তৈরি করি।

সমস্যা ১:
সমস্যা ২:

ওজন পরিমাপ

কোনো বস্তু কতটা ভারী বা হালকা এই ধারণাটি শুধুমাত্র চোখে দেখে নির্ণয় করা যায় না, এজন্য প্রয়োজন মানসম্মত পরিমাপের। বাজারে কোনো পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ, খাদ্য প্রস্তুতের উপকরণের পরিমাণ ঠিক রাখা, শিশুর বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ, কিংবা শিল্পক্ষেত্রে বা ইমারত তৈরিতে কাঁচামালের পরিমাণ নির্ধারণ-প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিখুঁত ওজন পরিমাপ অপরিহার্য। ওজন পরিমাপের এস আই একক হলো কিলোগ্রাম বা কেজি (Kg)। তবে বাস্তব জীবনে গ্রামও (g) বহুল ব্যবহৃত ওজন পরিমাপের একক। কারণ বাজারের বেশিরভাগ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রামে ওজন করা অধিক সুবিধাজনক হয়।

ওজন পরিমাপের বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্ক

ওজনের এককসমূহ

বড়ো ↑

১ কিলোগ্রাম (কেজি)	=	১০০০	গ্রা
১ হেক্টোগ্রাম (হেগ্রা)	=	১০০	গ্রা
১ ডেকাগ্রাম (ডেকাগ্রা)	=	১০	গ্রা
১ গ্রাম (গ্রা)	=	১	গ্রা
১ ডেসিগ্রাম (ডেসিগ্রা)	=	০.১	গ্রা বা $\frac{১}{১০}$ গ্রা
১ সেন্টিগ্রাম (সেন্টিগ্রা)	=	০.০১	গ্রা বা $\frac{১}{১০০}$ গ্রা
১ মিলিগ্রাম (মিগ্রা)	=	০.০০১	গ্রা বা $\frac{১}{১০০০}$ গ্রা

ছোটো ↓

আমরা সচরাচর রাস্তায় ট্রাকের গায়ে লেখা দেখে থাকি ‘সমগ্র বাংলাদেশ, ৫/১০ টন’। রড, বালু, সিমেন্ট, খাদ্যশস্য ইত্যাদি ভারী পদার্থ পরিমাপ করতে মেট্রিক টন, কুইন্টাল এ ধরনের একক ব্যবহার করা হয়।

১০০ কিলোগ্রাম (কেজি) = ১ কুইন্টাল
১০০০ কিলোগ্রাম (কেজি) = ১০ কুইন্টাল = ১ মেট্রিক টন

ওজন পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যা

১। নিচে প্রদত্ত ওজনগুলো হিসাব করি এবং খালিঘরের পাশে লেখা এককে প্রকাশ করি।

(ক) ১৫ কেজি ৬০০ গ্রা + ১৮ কেজি ৩০০ গ্রা = ☐ হেগ্রা

(খ) ৫ কেজি ৪০০ গ্রা – ৩ কেজি ৯০০ গ্রা = ☐ সেন্টিগ্রা

(গ) ৮ কেজি – ১২০০ গ্রা = ☐ ডেসিগ্রা

২। একটি বস্তায় ৩০ কেজি আটা রয়েছে। অনুরূপ কতগুলো বস্তা দ্বারা ১.৫ টনের একটি পিকআপ ভর্তি করা যাবে?

৩। মাহফুজ বাজার থেকে ৪.৫ কেজি চাল, ৮ হেক্টোগ্রাম সবজি এবং ২৫০০ গ্রাম মুরগীর মাংস কিনলো। সে মোট কত কেজি বাজার করলো?

আয়তন পরিমাপ

আয়তন পরিমাপ হলো কোনো তরল পদার্থ বা পাত্রের ভেতরে থাকা জায়গার পরিমাণ নির্ধারণের প্রক্রিয়া। পানি, দুধ, তেল, জুস, সিরাপ ইত্যাদি তরল পদার্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান এই তরল পদার্থগুলো ক্রয় বা ব্যবহার সর্বদাই সুনির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। যেমন ভাত রান্নার সময় কত কাপ পানি লাগবে, বাজার থেকে কত লিটার দুধ আনতে হবে, একটি আইস্ক্রিমের বক্স বা তেলের বোতলের ধারণক্ষমতা কত, এসব কাজ আয়তন পরিমাপ ছাড়া সম্ভব নয়। আয়তন পরিমাপের এস আই একক হলো লিটার (Litre).

আয়তন পরিমাপের বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্ক

আয়তনের এককসমূহ

বড়ো	১ কিলোলিটার (কিলি)	=	১০০০	লি
	১ হেক্টোলিটার (হেলি)	=	১০০	লি
	১ ডেকালিটার (ডেকালি)	=	১০	লি
	১ লিটার (লি)	=	১	লি
ছোটো	১ ডেসিলিটার (ডেসিলি)	=	০.১	লি বা $\frac{১}{১০}$ লি
	১ সেন্টিলিটার (সেন্টিলি)	=	০.০১	লি বা $\frac{১}{১০০}$ লি
	১ মিলিলিটার (মিলি)	=	০.০০১	লি বা $\frac{১}{১০০০}$ লি

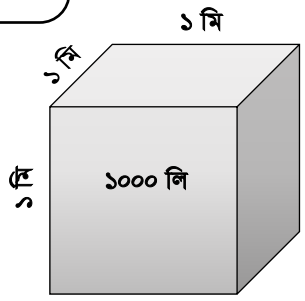

আমরা অনেক সময় বড় তেলের ট্যাংকে ঘনমিটার লেখা দেখতে পাই। ঘনমিটারও আয়তন পরিমাপের একটি প্রচলিত একক। ১ ঘনমিটার = ১০০০ লিটার; অর্থাৎ ১ মিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঘনক ১০০০ লিটার সমপরিমাণ তরল পদার্থ ধারণ করতে পারে।

আয়তন পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যা

১। খালিঘরে < (ছোটো) বা > (বড়) চিহ্ন বসাই

৩৫ লি ☐ ৩৫০০ মিলি

৫০০০ ডেকালি ☐ ৩ কিলি

৪০০ লি ☐ ১ ঘনমি

২। একটি পরিবারে বছরে ৩৫০০০ মিলিলিটার সয়াবিন তেল ব্যবহার করা হয়। তাহলে বছরে তাদের পরিবারে কত লিটার তেলের প্রয়োজন হয়?

দৈর্ঘ্য, ওজন ও আয়তন পরিমাপ শিখন শেখানো কৌশল

দৈর্ঘ্য, ওজন ও আয়তন পরিমাপ শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হলো হাতে-কলমে পরিমাপ অনুশীলন করানো এবং বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা। শিশুরা যখন নিজেরা মেপে

দেখে, তুলনা করে, ওজন করে কিংবা কোনো তরল পদার্থ মাপনীতে ঢেলে পরিমাণ নির্ধারণ করে, তখন পরিমাপের ধারণা তাদের কাছে স্পষ্ট, জীবন্ত ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। এজন্য শিক্ষক দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব বস্তু ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পরিমাপ অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-টেবিলের দৈর্ঘ্য, বইয়ের প্রস্থ বা জানালার দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা; বিভিন্ন বস্তুর দৈর্ঘ্য মেপে বড়-ছোট বা দূরে-কাছের তুলনা করা; আবার শ্রেণিকক্ষের বল, চক, বই, ফল বা পানি ভর্তি বোতল ব্যবহার করে ভারী-হালকা তুলনা করানো এবং দাড়িপাল্লা ও বাটখারা দিয়ে তা যাচাই করা। যেমন, শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন বস্তু যেমন, পেন্সিল, বই, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদির দৈর্ঘ্য স্কেল/মেজারিং টেপ দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাপতে দেওয়া, শিক্ষার্থীদের নিজেদের উচ্চতা পরিমাপ করতে দেয়া, স্কেলের মিলিমিটার দাগ ব্যবহার করে ক্ষুদ্র বস্তু মাপতে দেয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দৈর্ঘ্য পরিমাপের দক্ষতা অর্জন হয়। আবার ওজন পরিমাপে বাটখারা ব্যবহার করে নিক্তি/দাড়িপাল্লা বানিয়ে নির্দিষ্ট বস্তুর ওজন করা, নির্দিষ্ট ওজনের (যেমন ১কেজি ৬৫০ গ্রাম) সমান করতে কতগুলো বাটখারা লাগে তা সাজানো ইত্যাদি কাজ দেয়া যেতে পারে।

একইভাবে আয়তন পরিমাপ শেখাতে বিভিন্ন পাত্র; যেমন, কাপ, গ্লাস, মগ, ছোট বোতল বা বাটি ইত্যাদি ব্যবহার করে কোন পাত্রে বেশি পানি ধরে, কোনটিতে কম, বা কতবার পানি ঢাললে একটি পাত্র ভরে যায়, এসব হাতে-কলমে অনুশীলন করানো যেতে পারে। তরল পদার্থ অনুমান করানো এবং পরে বাস্তবে মেপে মিলিয়ে দেখা আয়তন পরিমাপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা, যৌক্তিকতা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ায়। গল্প, বাস্তব সমস্যা, অনুমানভিত্তিক কার্যক্রম, দলীয় কাজ ও পর্যবেক্ষণ-এসব সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক (Active Learning) কৌশল দৈর্ঘ্য, ওজন ও আয়তন পরিমাপ শেখানোর জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ফলে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চিন্তা, সমস্যা সমাধান, তুলনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জন হয় এবং তারা বাস্তব জীবনে পরিমাপের ধারণা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।

অনুশীলন: দৈর্ঘ্য, ওজন ও আয়তন পরিমাপের জন্য শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার্য কিছু কৌশল লিখি

দৈর্ঘ্য পরিমাপ	ওজন পরিমাপ	আয়তন পরিমাপ

সময় পরিমাপ

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঘুম থেকে ওঠা, স্কুলে/কাজে যাওয়া, খাবারের সময়, ক্লাসের বা পরীক্ষার ব্যাপ্তি সবকিছুই নির্দিষ্ট সময়ের ওপর নির্ভর করে। সময় পরিমাপের এস আই একক হলো সেকেন্ড (Second)। ঘড়ি, স্টপওয়াচ বা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে আমরা সময় নির্ণয় করি এবং দৈনন্দিন কাজ ও পরিকল্পনা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারি।

সময়ের রূপান্তর

১ মিনিট = ৬০ সেকেন্ড

১ ঘন্টা = ৬০ মিনিট = ৬০ × ৬০ সেকেন্ড = ৩৬০০ সেকেন্ড

১ দিন = ২৪ ঘণ্টা = ২৪ × ৩৬০০ সেকেন্ড = ৮৬৪০০ সেকেন্ড

১ সপ্তাহ = ৭ দিন = ৭ × ৮৬৪০০ সেকেন্ড = ৬০৪৮০০ সেকেন্ড

১ মাস = ৩০ দিন = ৩০ × ৮৬৪০০ সেকেন্ড = ২৫৯২০০০ সেকেন্ড

উদাহরণ:

১। একদিনে সাফিন ২ ঘন্টা ০৫ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড এবং স্নেহা ১ ঘন্টা ১৪ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড পড়ে। তারা দুজনে মোট কত সময় পড়েছে?

	ঘণ্টা	মিনিট	সেকেন্ড
	২	০৫$^{+১}$	৫৮
+	১	১৪	৩৫
	৩	২০	৩৩

[সেকেন্ড]
৫৮+৩৮=৯৩ সেকেন্ড এবং ৯৩=৬০+৩৩
অর্থাৎ, ১ মিনিট হাতে রয়েছে যা মিনিটের স্থানে যোগ করা হয়েছে।

২। নুরী এবং মেহেদী দুই ভাইবোন। নূরীর বয়স ১৩ বছর ৫ মাস এবং মেহেদীর বয়স ৮ বছর ৮ মাস। তাদের দুই ভাইবোনের বয়সের পার্থক্য কত?

	বছর	মাস
	~~১৩~~^{১২}	৫$^{+১২}$
-	৮	৮
	৪	৯

[মাস]
৫-৮, আমরা বিয়োগ করতে পারিনা। তাই, আমরা ১ বছরকে (১২ মাস) মাসের ঘরে নিয়ে আসি এবং (৫+১২) = ১৭ মাস থেকে ৮ মাস বিয়োগ করি।

অধিবর্ষ

অধিবর্ষ হলো এমন একটি বছর যে বছরে ক্যালেন্ডার বছরের সাথে ঋতু বছরের সমন্বয় স্থাপনের জন্য একদিন বেশি থাকে। অধিবর্ষ সাধারণত ৪ দ্বারা বিভাজ্য। তবে ৪ দ্বারা বিভাজ্য সকল সাল অধিবর্ষ নয়। কোনো সাল ১০০ দ্বারা বিভাজ্য হলে অধিবর্ষ হবেনা, তবে যদি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হয় তা হলে অধিবর্ষ হবে।

অধিবর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে ২৯ দিন থাকে যা অন্যান্য বছরের চেয়ে ১ দিন বেশি। আর তাই ঐ বছরে মোট দিন সংখ্যা ৩৬৬। একইভাবে যে ইংরেজি বছরে অধিবর্ষ হবে সেই বাংলা বছরে ফাল্গুন মাস ২৯ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিন গণনা করতে হবে।

মাসের নাম	দিনসংখ্যা
জানুয়ারি	৩১
ফেব্রুয়ারি	২৮/২৯
মার্চ	৩১
এপ্রিল	৩০
মে	৩১
জুন	৩০
জুলাই	৩১
আগস্ট	৩১
সেপ্টেম্বর	৩০
অক্টোবর	৩১
নভেম্বর	৩০
ডিসেম্বর	৩১

দশক, যুগ ও শতাব্দী

- ধারাবাহিক ১০ বছরের সময়কাল হলো = ১ দশক
- ধারাবাহিক ১২ বছরে সময়কাল হলো = ১ যুগ
- ধারাবাহিক ১০০ বছরের সময়কাল হলো = ১ শতাব্দী

সময় পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যা

১। পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিলো ১৭৫৭ সালে। এটি কোন শতাব্দীতে পড়ে?

২। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ। আমরা বিজয় অর্জন করি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। তাহলে কত সময় মুক্তিযুদ্ধ চলেছে?

৩। ২০২৮ সালটি অধিবর্ষ। ১লা জানুয়ারি ২০২৮ শনিবার হলে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৮ কী বার হবে?

সময় পরিমাপ শিখন শেখানো কৌশল

সময় একটি বিমূর্ত ধারণা, তাই শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সময়কে যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক প্রথমে দিনের বিভিন্ন কাজ যেমন, ঘুম থেকে ওঠা, স্কুলে যাওয়া, খেলাধুলা, খাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, যাতে শিক্ষার্থীরা সময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এরপর ঘড়ি পরিচিত করাতে একটি বড় দেয়ালঘড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে, যেখানে ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে সময়ের পরিবর্তন প্রদর্শন করা যায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে নিজেরা কাঁটা ঘুরিয়ে বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করতে দিতে পারেন—যেমন "৮টা বাজাও", "সাড়ে ৯টা দেখাও", "৫ মিনিট পরে কাঁটা কোথায় যাবে"। এতে শিশুদের ধারণা অনেক দ্রুত পরিস্কার হয়। এছাড়াও সময় পরিমাপে ক্যালেন্ডার ব্যবহার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষক ক্যালেন্ডারে মাসের নাম, দিনের সংখ্যা, সপ্তাহের দিনগুলো চিহ্নিত করা, বিশেষ দিন খুঁজে বের করা, দুই তারিখের ব্যবধান বের করা এসব কার্যক্রম করতে দিতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা সময়ের হিসাব করার দক্ষতা অর্জন করে। অধিবর্ষ (Leap Year) বোঝাতে শিক্ষক ৪ বছরে একবার ফেব্রুয়ারি মাসে অতিরিক্ত দিন যুক্ত হওয়ার কারণ ও উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারেন। বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রে "জন্মসাল থেকে বর্তমান সাল বিয়োগ করে বয়স বের করা" পদ্ধতি ব্যবহার করতে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সময় সম্পর্কিত সমস্যা অনুশীলন করাতে পারেন।

ক্ষেত্রফল পরিমাপ

আয়ত ও বর্গের ক্ষেত্রফল

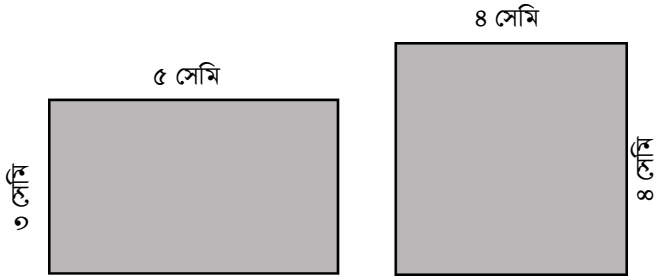

প্রশ্ন: পাশের চিত্রে একটি আয়ত ও একটি বর্গ রয়েছে। এখানে কোন আকৃতিটি বেশি জায়গা দখল করেছে, অর্থাৎ কোনটি বড়?

আমরা জানি, একটি আকৃতি যতটুকু জায়গা বা ক্ষেত্র দখল করে তাকে সেই আকৃতির ক্ষেত্রফল বলে। অর্থাৎ এই আকৃতি দুটির মধ্যে কে বড় তা বের করতে হলে প্রথমে তাদের ক্ষেত্রফল বের করা দরকার। আমরা এই আয়ত ও বর্গক্ষেত্রটিকে একটি ১ সেমি × ১ সেমি ঘর বিশিষ্ট ছক কাগজে বসিয়ে সহজেই এর ক্ষেত্রফল বের করতে পারি।

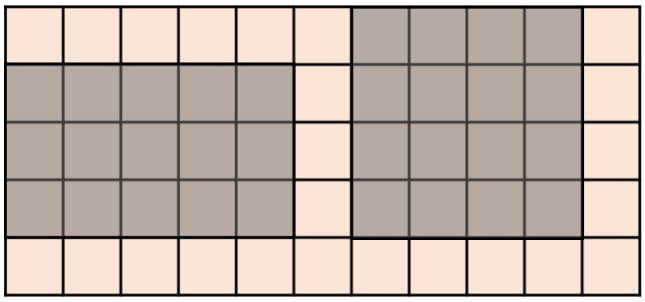

পাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে, আয়তক্ষেত্রটি ১৫টি ১সেমি×১সেমি অর্থাৎ ১ বর্গসেমি ঘর দখল করে রয়েছে। অর্থাৎ আয়তটির ক্ষেত্রফল ১৫ বর্গসেমি।

অপরদিকে, বর্গক্ষেত্রটি ১৬টি ১সেমি×১সেমি অর্থাৎ ১ বর্গসেমি ঘর দখল করে রয়েছে। অর্থাৎ বর্গটির ক্ষেত্রফল ১৬ বর্গসেমি।

সুতরাং, উপরের চিত্র থেকে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে,

আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ বর্গএকক

বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × দৈর্ঘ্য বর্গএকক (যেহেতু বর্গের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান)

সামান্তরিক ও রম্বসের ক্ষেত্রফল

পাশের চিত্রে ৫ সেমি ভূমি ও ৪ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি সামান্তরিক রয়েছে। সামান্তরিকটির ক্ষেত্রফল আমরা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি?

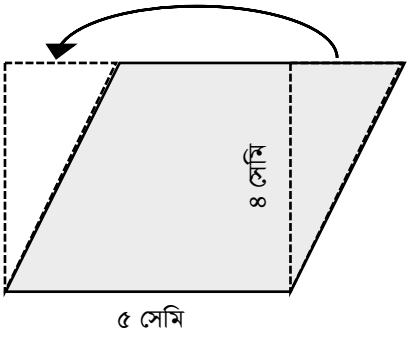

চিত্রটি লক্ষ্য করি, সামান্তরিকটির লম্ব বরাবর ত্রিভুজাকার আকৃতিটি কেটে বিপরীত পাশে বসাই। ফলে একটি আয়ত তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ আয়তটির ক্ষেত্রফল সামন্তরিকটির ক্ষেত্রফলের সমান হবে।

আমরা জানি, আয়তের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ
যেহেতু, আয়তটির দৈর্ঘ্য ও সামান্তরিকটির ভূমি একই এবং আয়তের প্রস্থ ও সামান্তরিকটির উচ্চতা একই
অতএব, সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি × উচ্চতা
একই প্রক্রিয়ায় আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফলও বের করতে পারি।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

পাশের চিত্রে ৫ সেমি ভূমি ও ৩ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ রয়েছে। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল আমরা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি?

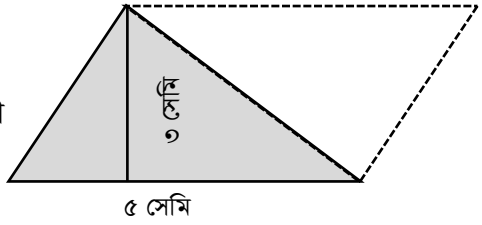

চিত্রটি লক্ষ্য করি, ত্রিভুজটির সমান একই আকৃতির আরেকটি ত্রিভুজ উল্টো করে বসালে একটি সামান্তরিক তৈরি হয়, যার দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা ত্রিভুজটির দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার সমান।

আমরা জানি, সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি × উচ্চতা
তাহলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল হবে সামান্তরিকটির ক্ষেত্রফলের অর্ধেক
অতএব, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২}$ × ভূমি × উচ্চতা

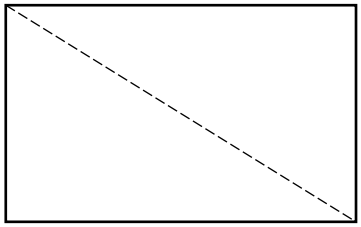

সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে খুব সহজেই একটি A4 আকৃতির পেপারকে আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে ত্রিভুজটি যে একটি আয়তের অর্ধেক তা প্রমাণ করা যায়।

উদাহরণ: পাশের ঘরের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি।

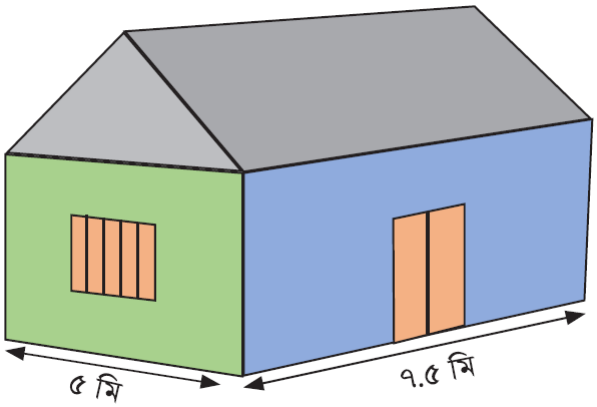

সমাধান:

ক্ষেত্রফল পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যা

১। ডানপাশের L আকৃতির ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? কতভাবে এর ক্ষেত্রফল বের করা যায়?

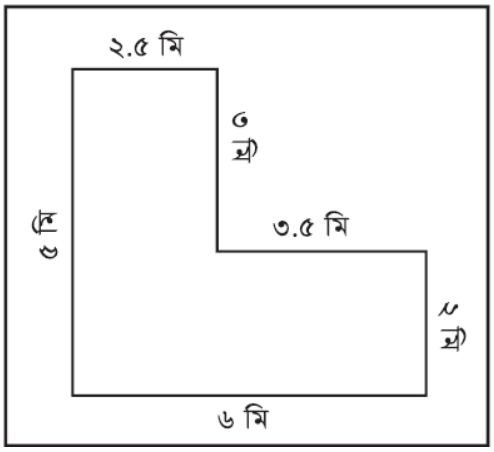

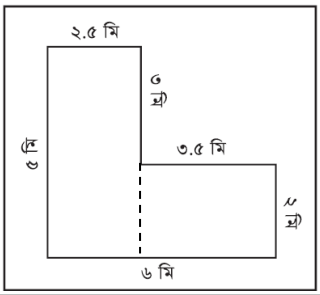

চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল এরকম ২টি আয়তক্ষেত্রের সমষ্টি

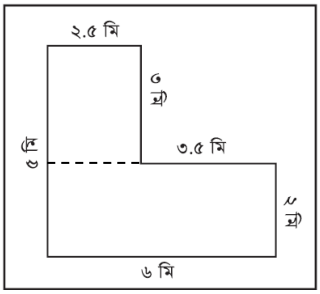

অথবা, চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল এরকম ২টি আয়তক্ষেত্রের সমষ্টি

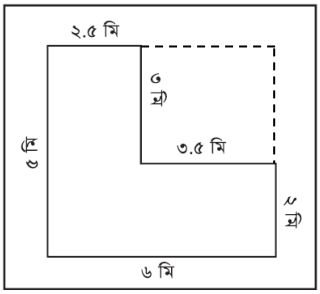

অথবা, চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল এই বড় আয়তক্ষেত্র ও ছোট আয়তক্ষেত্রের পার্থক্য

২। নিচের ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রফল কয়েকটি উপায়ে নির্নয় করি।

(১)

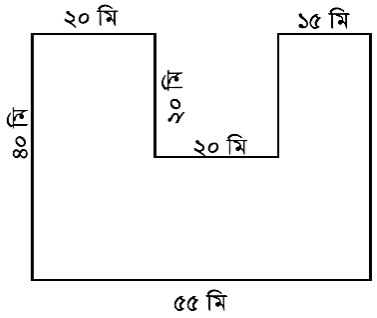

(২)

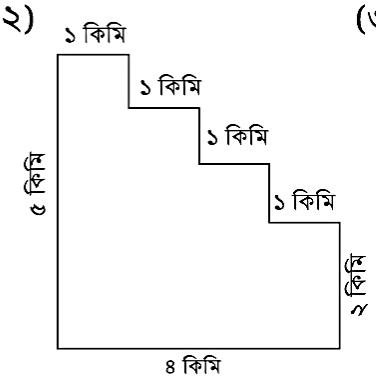

(৩)

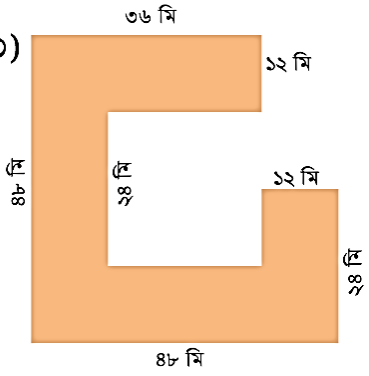

৩। নিচের আকৃতিগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি।

(১)

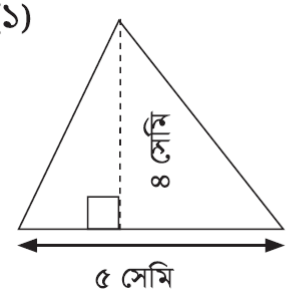

(২)

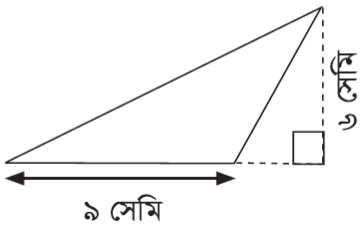

(৩)

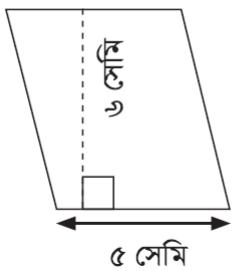

(৪)

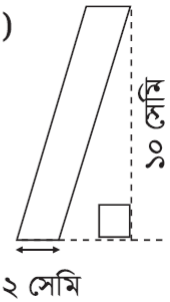

অধ্যায় ১১

জ্যামিতি ও প্যাটার্ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের গাণিতিক বিষয়বস্তুগুলোতে নিজের মাঝে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা এবং সেই ধারণা কীভাবে শিশুদের উপযোগী করে শেখানো যায় এই দুই ধরনের সক্ষমতা অর্জনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় 'জ্যামিতি ও প্যাটার্ন' অধ্যায়টি গণিত বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা জ্যামিতির মৌলিক ধারণা যেমন লাভ করতে পারে, তেমনি তা কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশলের মাধ্যমে শিশুদের শেখাতে সক্ষম হয়। একইসঙ্গে তারা শিখবে, কীভাবে এসব ধারণাকে সহজ ভাষা, দৃশ্যমান উপকরণ, হাতে-কলমে কার্যক্রম ও শিশুদের মানসিক বিকাশের উপযোগী কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায়।

এই অধ্যায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো জ্যামিতিক প্যাটার্ন। পুনরাবৃত্তি, প্রতিসাম্য বা সাজানোর নিয়মের মাধ্যমে এসব প্যাটার্ন শিশুর বিশ্লেষণক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিবিন্যাস, পূর্বানুমান করার দক্ষতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীরা এই অংশে শিখবে কীভাবে বিভিন্ন আকৃতি ব্যবহার করে শিক্ষণীয় প্যাটার্ন তৈরি করা যায় এবং কীভাবে শ্রেণিকক্ষে তা ব্যবহার করে শিশুদের যুক্তি-চিন্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করা যায়।

সব মিলিয়ে, 'জ্যামিতি ও প্যাটার্ন' অধ্যায়টি শুধুমাত্র বিষয়জ্ঞান শক্তিশালী করার জন্য নয়; বরং ভবিষ্যৎ শিক্ষক হিসেবে নিজের ক্লাসে জ্যামিতিকে আনন্দময়, বোধগম্য ও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করার সক্ষমতা গড়ে তুলতেই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের গণিত পাঠ্যবইয়ে জ্যামিতির বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত জ্যামিতি সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলো শিশুর বয়স ও মানসিক বিকাশ বিবেচনায় ধাপে ধাপে সাজানো হয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণিতে মূলত গোল, তিনকোণা ও চারকোণা আকৃতির সাথে পরিচয়, আকৃতি সনাক্ত করা, বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করে এগুলো আকৃতি আঁকা এবং আকৃতিগুলো ব্যবহার করে ইচ্ছেমত নতুন আকৃতি তৈরি ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণিতে তারা বিন্দু, রেখা, তল ও কোণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। চতুর্ভুজ আকৃতি চেনে ও আঁকতে শেখে। ৪র্থ শ্রেণিতে এসে তারা ত্রিভুজের প্রকারভেদ, চতুর্ভুজের প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য, কোণ আঁকতে শেখা ইত্যাদি অনুশীলন করে। ৫ম শ্রেণিতে তারা জ্যামিতিক আকৃতিগুলোর তুলনা, পরিমাপ, বৃত্ত ও এর উপাদান এবং এগুলো যথাযথভাবে অঙ্কন করার দক্ষতা অর্জন করে। এছাড়া ১ম থেকে শুরু করে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতেই বিভিন্ন প্যাটার্ন চেনা ও প্যাটার্ন তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রিভুজ

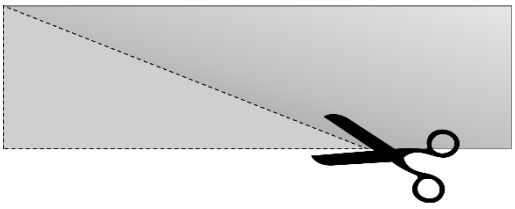

ত্রিভুজ হলো জ্যামিতির একটি মৌলিক এবং সবচেয়ে সহজ বহুভুজ, যার তিনটি বাহু ও তিনটি কোণ থাকে। সহজভাবে বলতে গেলে, তিনটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ আকৃতিকে ত্রিভুজ বলে। তবে লক্ষ্য করুন, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে ত্রিভুজের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার উল্লেখ নেই। বরং বিভিন্নভাবে ত্রিভুজের ধারণার অবতারণা করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে একটি শক্ত কাগজ বা আর্ট পেপার নিয়ে চিত্রের মত করে কেটে ত্রিভুজ তৈরি করা যায়। এখান থেকে শিক্ষার্থীরা ৩টি বাহু, ৩টি কোণ ও শীর্ষবিন্দুর ধারণা পাবে। একইসাথে এই আকৃতিটি বোর্ডে বসিয়ে শিক্ষক ত্রিভুজ আঁকতেও পারবেন।

ত্রিভুজের প্রকারভেদ: বাহুভেদে ও কোণভেদে

ত্রিভুজের বাহু তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। যেমন, কখনো কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহুই সমান, কখনো কোনো ত্রিভুজের দুইটি বাহু সমান, কখনো কোন ত্রিভুজের তিনটিই বাহুই পরস্পর অসমান। তাই ত্রিভুজের কয়টি বাহু সমান তার উপর ভিত্তি করে ত্রিভুজকে তিনটি সুনির্দিষ্ট নাম দেয়া হয়েছে -যা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

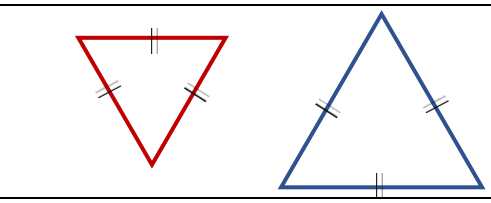	১। তিনটি বাহু পরস্পর সমান ২। তিনটি কোণের পরিমাণ সমান ৩। প্রতিটি কোণের পরিমাণ ৬০°	**সমবাহু ত্রিভুজ**
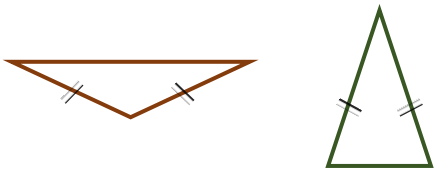	১। দুইটি বাহু পরস্পর সমান ২। সমান বাহুসংলগ্ন বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সমান ৩। সকল সমবাহু ত্রিভুজই সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ	**সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ**
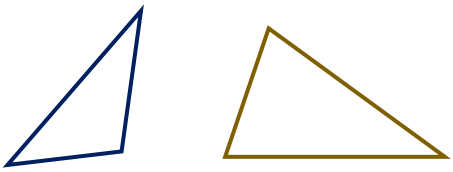	১। তিনটি বাহু অসমান ৩। কোনো কোণই সমান নয়	**বিষমবাহু ত্রিভুজ**

কোণের পরিমাণের ভিত্তিতেও ত্রিভুজ কয়েক ধরনের হয় -

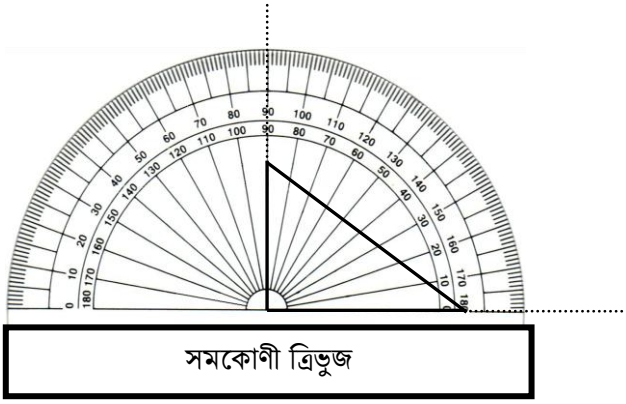

সমকোণী ত্রিভুজ

যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ বা একটি কোণের পরিমাপ ৯০° এর সমান, তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে।

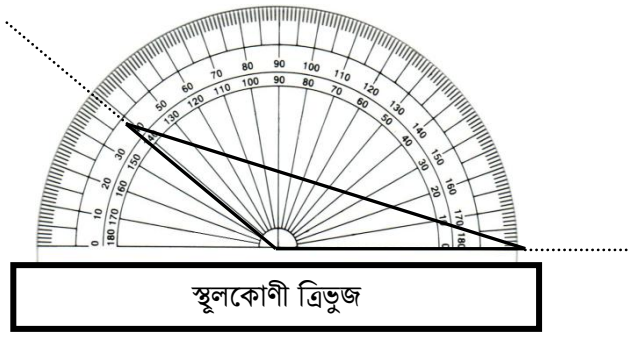

স্থূলকোণী ত্রিভুজ

যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূলকোণ অর্থাৎ ৯০° এর বড়, তাকে স্থূলকোণী ত্রিভুজ বলে।

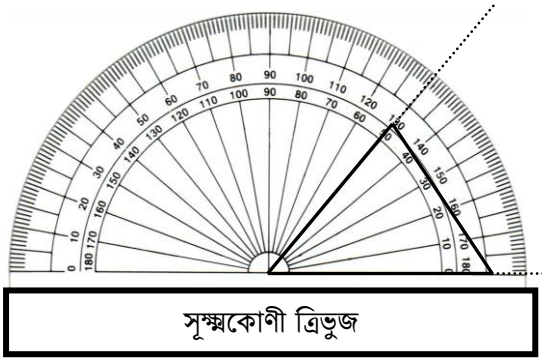

সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ

যে ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোণ সূক্ষ্মকোণ অর্থাৎ প্রত্যেকটি কোণের পরিমাপ ৯০° এর কম, তাকে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ বলে।

ত্রিভুজ সম্পর্কিত সমস্যা

১। চাঁদার সাহায্যে নিচের ত্রিভুজের কোণগুলো ও স্কেলের সাহায্যে ত্রিভুজের বাহুগুলো পরিমাপ করে নিচের ছক পূরণ করি-

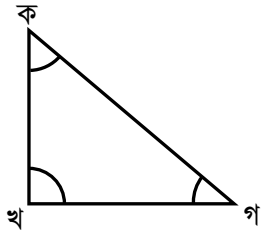

চিত্র: ০১

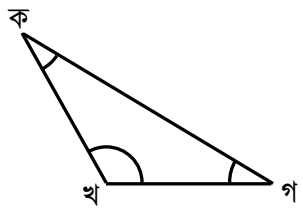

চিত্র: ০২

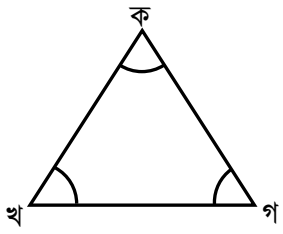

চিত্র: ০৩

চিত্র নম্বর	কোণগুলোর পরিমাণ	বাহুগুলোর পরিমাণ	ত্রিভুজের প্রকার
০১	∠ক = _____ডিগ্রি	কখ = _____ সেমি	বাহুভেদে: _____ত্রিভুজ কোণভেদে: _____ত্রিভুজ
	∠খ = _____ডিগ্রি	খগ = _____ সেমি	
	∠গ = _____ডিগ্রি	গক = _____ সেমি	
০২	∠ক = _____ডিগ্রি	কখ = _____ সেমি	বাহুভেদে: _____ত্রিভুজ কোণভেদে: _____ত্রিভুজ
	∠খ = _____ডিগ্রি	খগ = _____ সেমি	
	∠গ = _____ডিগ্রি	গক = _____ সেমি	
০৩	∠ক = _____ডিগ্রি	কখ = _____ সেমি	বাহুভেদে: _____ত্রিভুজ কোণভেদে: _____ত্রিভুজ
	∠খ = _____ডিগ্রি	খগ = _____ সেমি	
	∠গ = _____ডিগ্রি	গক = _____ সেমি	

২। ৭ সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকি।

৩। ৪ সেমি, ৫ সেমি ও ৬ সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকি এবং কোণগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করি।

৪। একটি ত্রিভুজ আঁকি যার দুইটি কোণের পরিমাণ ৪৫° ও ৪৫°। ত্রিভুজটি বাহুভেদে ও কোণভেদে কী ধরনের ত্রিভুজ তা খুঁজে বের করি।

চতুর্ভুজ

চারটি সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ আকৃতিকে চতুর্ভুজ বলে। চতুর্ভুজ দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত পরিচিত একটি আকৃতি। আমাদের বইয়ের কাভার, দরজা, টেবিল, ঘরের জানালা, টাইলস, নকশা ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস চতুর্ভুজ আকৃতির বা চতুর্ভুজের সমন্বয়ে তৈরি। ফলে প্রাথমিক স্তরে চতুর্ভুজ শেখা শুধু জ্যামিতিক জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, বরং চারপাশের আকৃতি চিনে নেওয়া, শ্রেণিবিন্যাস করা এবং বাস্তব উদাহরণ দিয়ে জ্যামিতি বোঝার জন্যও প্রয়োজনীয়। চতুর্ভুজের কোণের সংখ্যা ৪টি। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ত্রিভুজের মতই কাগজ কেটে, কাঠি সাজিয়ে বোর্ডে ৪টি বিন্দু লাইন টেনে যোগ করে চতুর্ভুজের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন।

চতুর্ভুজের প্রকারভেদ

চারটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে। চতুর্ভুজের বাহু ও কোণ তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। বাহুর ও কোণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চতুর্ভুজগুলোকে আমরা আলাদা করে দলভুক্ত করতে পারি।

চিত্র	বাহু ও কোণের বৈশিষ্ট্য	চতুর্ভুজের নাম
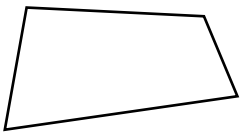	এই চতুর্ভুজের বাহু এবং কোণগুলোর কোনো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই। তাই একে আমরা অনিয়মিত চতুর্ভুজ বলতে পারি।	**অনিয়মিত চতুর্ভুজ**
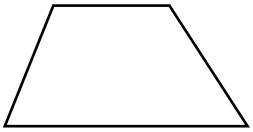	এই চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু পরস্পর সমান্তরাল।	**ট্রাপিজিয়াম**
	এই চতুর্ভুজের দুই জোড়া বিপরীত বাহু পরস্পর সমান্তরাল।	**সামান্তরিক** *(ট্রাপিজিয়ামের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যাওয়ায় প্রতিটি সামান্তরিকই একটি ট্রাপিজিয়াম)*
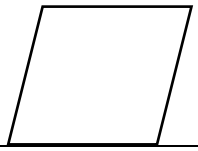	এই সামান্তরিকের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান।	**রম্বস** *(ট্রাপিজিয়াম এবং সামান্তরিকের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যাওয়ায় প্রতিটি রম্বসই একটি ট্রাপিজিয়াম ও সামান্তরিক)*
	এই চতুর্ভুজের চারটি কোণই সমকোণ।	**আয়ত** *(ট্রাপিজিয়াম এবং সামান্তরিকের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যাওয়ায় প্রতিটি আয়তই একটি ট্রাপিজিয়াম ও সামান্তরিক)*
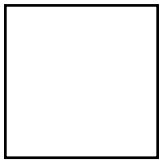	এই আয়তের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান।	**বর্গ** *(ট্রাপিজিয়াম, সামান্তরিক, আয়ত ও রম্বসের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যাওয়ায় প্রতিটি বর্গই একটি ট্রাপিজিয়াম, সামান্তরিক, আয়ত এবং রম্বস)*

চতুর্ভুজের কর্ণ

কোন চর্তুভুজের বিপরীত শীর্ষবিন্দুর সংযোগকারী রেখাকে কর্ণ বলা হয়। একটি চর্তুভুজের দুইটি কর্ণ রয়েছে- কিন্তু ত্রিভুজের কোন কর্ণ নেই। পাশের চিত্রে কগ এবং খঘ চর্তুভুজটির দুটি কর্ণ।

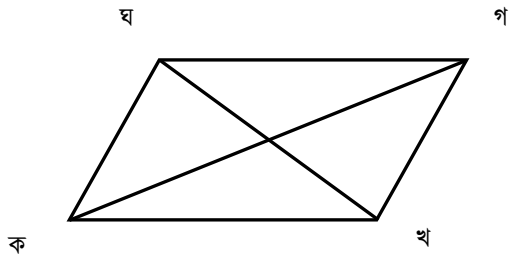

অনুশীলন: নিচের ছকে আয়ত, বর্গ, সামান্তরিক, রম্বস ও ট্রাপিজিয়ামের চিত্র আঁকি এবং বৈশিষ্ট্যাবলি লিপিবদ্ধ করি।

চতুর্ভুজের ধরন	চিত্র	বৈশিষ্ট্য
আয়ত		*বাহুর বৈশিষ্ট্য:* *কোণের বৈশিষ্ট্য:* *কর্ণের বৈশিষ্ট্য:*
বর্গ		*বাহুর বৈশিষ্ট্য:* *কোণের বৈশিষ্ট্য:* *কর্ণের বৈশিষ্ট্য:*
সামান্তরিক		*বাহুর বৈশিষ্ট্য:* *কোণের বৈশিষ্ট্য:* *কর্ণের বৈশিষ্ট্য:*
রম্বস		*বাহুর বৈশিষ্ট্য:* *কোণের বৈশিষ্ট্য:* *কর্ণের বৈশিষ্ট্য:*
ট্রাপিজিয়াম		*বাহুর বৈশিষ্ট্য:* *কোণের বৈশিষ্ট্য:* *কর্ণের বৈশিষ্ট্য:*

চতুর্ভুজ সম্পর্কিত সমস্যা

১। নিচের চতুর্ভুজগুলো আঁকি।

ক. দৈর্ঘ্য ৪ সেমি, প্রস্থ ২.৫ সেমি এবং একটি কোণ ৫৫°

খ. দৈর্ঘ্য ৫ সেমি, প্রস্থ ৩ সেমি এবং একটি কোণ ৯০°

গ. প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৬ সেমি এবং একটি কোণ ৩৫°

২। ডানপাশের সামান্তরিকের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য এবং কোণগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করি।

১. কঘ = _____ সেমি

২. গঘ = _____ সেমি

৩. ∠ক = _____ °

৪. ∠ক = _____ °

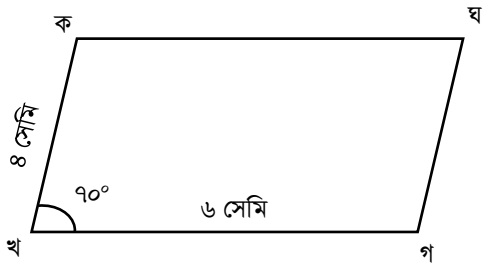

বৃত্ত

বাস্তব জীবনে বৃত্ত অত্যন্ত পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত একটি আকৃতি। আমাদের চারপাশে চাকা, প্লেট, ঘড়ি, কয়েন, চুড়ি, ঢাকনা ইত্যাদি অসংখ্য বস্তুতে এবং প্রকৃতিতে যেমন, সূর্য-চন্দ্রের দৃশ্যমান রূপসহ বহু জায়গায় বৃত্তের উপস্থিতি দেখা যায়। একটি সাদা কাগজের উপর একটি কয়েন রেখে চারদিকে পেন্সিল দিয়ে একটি দাগ টানি। একটি গোলাকার আকৃতি পাওয়া গেল। এই গোলাকার আকৃতিকেই বলা হয় বৃত্ত।

বৃত্তের বিভিন্ন অংশ

পরিধি: যে বক্ররেখা বৃত্তটিকে আবদ্ধ করে রাখে তাকে বলা হয় বৃত্তের পরিধি।

কেন্দ্র: পরিধির প্রত্যেক বিন্দু ভিতরের একটি বিন্দু থেকে সমান দূরে। বৃত্তের ভিতরের এই নির্দিষ্ট বিন্দুটি বৃত্তের কেন্দ্র।

ব্যাসার্ধ: ব্যাসার্ধ হলো কেন্দ্র থেকে পরিধির দূরত্ব। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ সবসময় সমান।

বৃত্তচাপ: বৃত্তচাপ হলো পরিধির একটি অংশ।

জ্যা: জ্যা হলো একটি বৃত্তচাপের প্রান্তবিন্দু দুইটির সংযোজক রেখাংশ।

ব্যাস: ব্যাস হলো বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যা। ব্যাস হলো বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা।

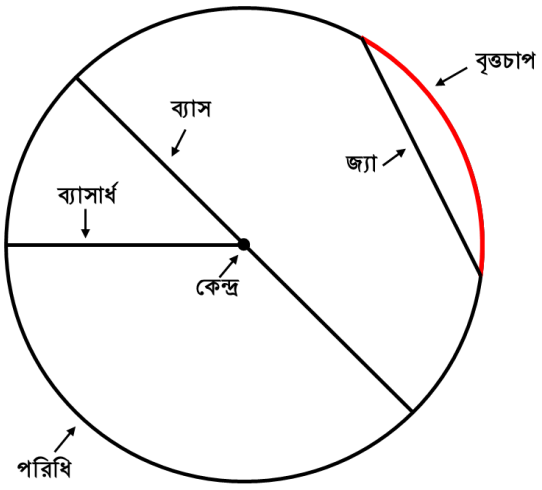

বৃত্ত সম্পর্কিত সমস্যা

১। নিচের চিত্রের মত ৩৬ সেমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি বাক্সে ৩টি সিডি রাখা যায়। ১টি সিডির ব্যাসার্ধ কত?

২। ৩০ মিলিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত আঁকি।

৩। একটি বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যা'র দৈর্ঘ্য ৬ সেন্টিমিটার। বৃত্তটি আঁকি এবং অঙ্কিত বৃত্তের ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখি।

জ্যামিতি শিখন-শেখানো কৌশল

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জ্যামিতি শেখাতে প্রয়োজন এমন কৌশল, যা শেখাকে স্বতঃস্ফূর্ত, অনুসন্ধানভিত্তিক এবং অভিজ্ঞতাপূর্ণ করে তোলে। জ্যামিতির ধারণা তখনই স্পষ্ট হয়, যখন শিশুরা চারপাশের আকৃতি লক্ষ্য করে, মিলিয়ে দেখে এবং বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে আকৃতির বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে পারে। তাই জ্যামিতি শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সহজলভ্য সামগ্রী ব্যবহার, পর্যবেক্ষণমূলক কার্যক্রম এবং সমস্যা-সমাধানভিত্তিক কাজ অত্যন্ত কার্যকর। নিচে জ্যামিতি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিছু কার্যকর কৌশল আলোচনা করা হলো-

১. বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আকৃতি চেনানো: শ্রেণিকক্ষ বা আশেপাশের জিনিস ব্যবহার করে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি চেনানো। যেমন: দেয়াল ঘড়ি (বৃত্ত), বই বা দরজা (আয়ত), কাগজ ভাঁজ করা (ত্রিভুজ) ইত্যাদি।

২. সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে হাতে-কলমে আকৃতি তৈরি: স্ট্র, কাঠি, দড়ি, রাবার ব্যান্ড, রঙিন কাগজ, বোতলের ঢাকনা এসব দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই আকৃতি তৈরি করলে সে আকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারে। যেমন: তিনটি কাঠি দিয়ে ত্রিভুজ, চারটি স্ট্র দিয়ে চতুর্ভুজ তৈরি ইত্যাদি।

৩. আকৃতি আঁকা চিহ্নিতকরণ অনুশীলন: স্কেল, কম্পাস, রঙিন পেন্সিল ব্যবহার করে আকৃতি আঁকানো ও কেন্দ্র, ব্যাসার্ধ, বাহু, কোণ ইত্যাদি চিহ্নিত করানো। বাহু, কোণ পরিমাপ করা।

৪. খেলার মাধ্যমে শেখানো: "আকৃতি খুঁজে বের করো", "ক্লাসের মধ্যে কতগুলো আয়ত ও বৃত্ত আছে?", "আমি যে আকৃতির কথা ভাবছি তা অনুমান করো" এ ধরনের খেলা শিশুদের আনন্দদায়কভাবে শিখতে সহায়তা করে।

অনুশীলন: ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্ত শিখনের জন্য শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার্য কিছু কৌশল লিখি

ত্রিভুজ	চতুর্ভুজ	বৃত্ত

প্যাটার্ন

প্যাটার্ন হলো কোনো সংখ্যা, আকৃতি, রঙ বা বস্তু এমনভাবে সাজানো, যেখানে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বারবার পুনরাবৃত্তি হয়। অর্থাৎ প্যাটার্নে সবকিছুর পেছনে একটি নিয়ম থাকে, এবং সেই নিয়মটি অবিরত একইভাবে চলতে থাকে। তাই প্যাটার্ন দেখলে আমরা বুঝতে পারি—পরের ধাপে কী আসবে, কীভাবে পরিবর্তন হবে, বা কোন ধারাটি অনুসরণ করা হচ্ছে। আমাদের চারপাশে তাকালে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন দেখতে পাই।

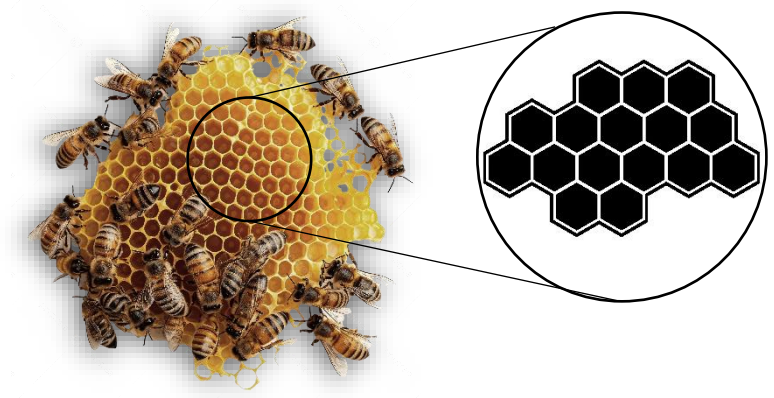

যেমন, মৌমাছির চাকে খুব সুন্দর জ্যামিতিক আকৃতির প্যাটার্ন রয়েছে। এই আকৃতির নাম হলো ষড়ভুজ। এই প্যাটার্নকে আমরা ষড়ভুজ প্যাটার্ন বলতে পারি।

গণিতের জগতে প্যাটার্ন একটি মৌলিক ধারণা, কারণ এর মাধ্যমে শিশুরা নিয়ম খুঁজে বের করা, যুক্তি প্রয়োগ করা এবং পূর্বানুমান করার দক্ষতা অর্জন করে। প্যাটার্ন শুধু জ্যামিতিক আকারেই নয়, বরং সংখ্যা, রঙ, শব্দ, নড়াচড়া অথবা বাস্তব জীবনের নানা গঠনেও দেখা যায়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা প্যাটার্ন শনাক্ত করতে শিখলে গণিতের বড় বড় ধারণা যেমন সংখ্যার ধারাবাহিকতা, গুণিতক, গুণনীয়ক, প্রতিসাম্য, জ্যামিতির নিয়ম ইত্যাদি সহজে বুঝতে পারে। এজন্য প্রাথমিক স্তরে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি পাঠ্যবইয়েই প্যাটার্ন অংশটি যুক্ত করা হয়েছে।

সংখ্যা প্যাটার্ন

সংখ্যা প্যাটার্ন হলো এমন একটি ধারাবাহিক সংখ্যা সাজানোর পদ্ধতি, যেখানে সংখ্যাগুলো একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে বাড়ে, কমে বা পরিবর্তিত হয়। যেহেতু সংখ্যা প্যাটার্নে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে, তাই ধারাটি দেখে সহজেই বোঝা যায় পরের সংখ্যা কী হবে বা কীভাবে বদলাবে। যেমন,

২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২ ..... (প্রতিবার ২ যোগ করে তৈরি প্যাটার্ন)

২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ .....(প্রতিবার ২ গুণ করে তৈরি প্যাটার্ন)

১, ৩, ৬, ১০, ১৫, ২১ ..... (প্রতিবার ধাপে ধাপে বাড়তি সংখ্যা যোগ করে তৈরি প্যাটার্ন)

জ্যামিতিক প্যাটার্ন

জ্যামিতিক প্যাটার্ন হলো এমন একটি প্যাটার্ন যেখানে জ্যামিতিক আকৃতি, যেমন বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ অথবা রেখা, বিন্দু, কোণ ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে সাজানো থাকে। এই প্যাটার্নে আকৃতিগুলো একইভাবে পুনরাবৃত্ত, প্রতিসাম্যপূর্ণ বা নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজানো থাকে। সহজভাবে বললে, জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে কোনো নিয়ম মেনে সাজানোর ধারাই হলো জ্যামিতিক প্যাটার্ন।

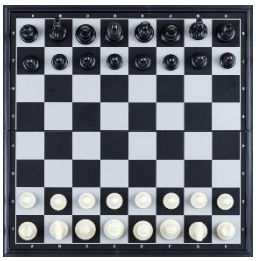

যেমন, আমরা ইটের তৈরি দেয়াল, জানালার গ্রিল বা দাবার বোর্ডে বিভিন্ন আকৃতির জ্যামিতিক প্যাটার্ন দেখতে পাই।

অনুশীলন:

১। নিচের জ্যামিতিক প্যাটার্নগুলো লক্ষ্য করি ও পাশের খালিঘরে অনুরূপ যেকোনো একটি প্যাটার্ন আঁকি

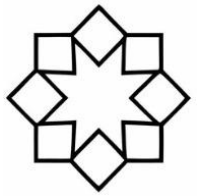
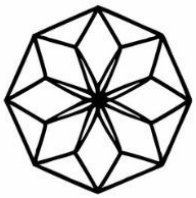

২। নিচের ডট কাগজে ইচ্ছেমত জ্যামিতিক প্যাটার্ন তৈরি করি

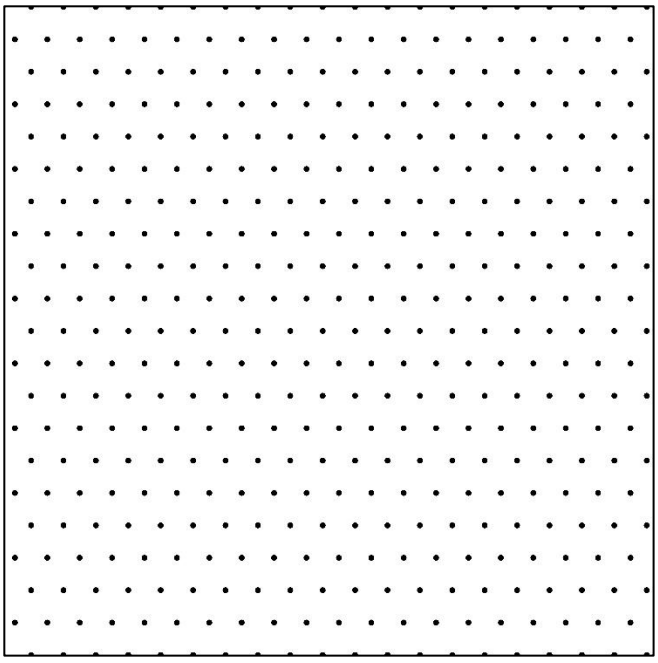

৩। আমাদের আশেপাশের বিভিন্ন বস্তুর জ্যামিতিক আকৃতির প্যাটার্ন খুঁজে বের করি ও নিচের ছকটি পুরণ করি

বস্তুর নাম	প্যাটার্ন

প্যাটার্ন শিখন শেখানো কার্যাবলী

প্যাটার্ন শিখন-শেখানোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়ম খুঁজে বের করার অভ্যাস গড়ে তোলা। শিক্ষক প্রথমে খুব পরিচিত ও সহজ উপকরণ, যেমন: রঙিন কাগজ, ছোট কাঠি, বোতাম, বোতলের ছিপি, পাথর বা শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করে প্যাটার্ন তৈরি দেখাতে পারেন। এরপর শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্যাটার্ন ও জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে প্যাটার্নের ধারণা দিতে হয়। তারা চারপাশের বিভিন্ন আকৃতির মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে পেতে শেখে ও প্যাটার্ন সনাক্ত করতে শেখে। শিক্ষার্থীদের সাদা কাগজে বা ডট কাগজে ইচ্ছেমত বা নির্দেশিত প্যাটার্ন আঁকতে দিয়ে তাদের যৌক্তিক ও নান্দনিক স্বত্বার বিকাশ ঘটানো যায়।

সংখ্যা ও জ্যামিতিক আকৃতির প্যাটার্নকে বাস্তব জীবনের উদাহরণের সাথে যুক্ত করলে শেখা আরও অর্থবহ হয়। যেমন টাইলসের নকশা, দালানের গঠন বা জামার প্রিন্ট। ধাপে ধাপে জটিলতা বাড়িয়ে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্যাটার্ন শেখানো যায়, যা ভবিষ্যতে বীজগণিতের ভিত্তি গড়ে তোলে। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ, আলোচনা, খেলা এবং ছোট চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করলে তাদের প্যাটার্ন বুঝে বিশ্লেষণ করার দক্ষতার যথাযথ উন্নয়ন হয়।

অনুশীলন: প্যাটার্ন শিখনের জন্য শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী কয়েকটি কৌশল নিচের ছকে লিখুন

সংখ্যা প্যাটার্ন	জ্যামিতিক প্যাটার্ন

অধ্যায় ১২
উপাত্ত

উপাত্ত উপস্থাপন গণিত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদের চারপাশে প্রতিদিনই নানা ধরনের তথ্য থাকে। কখনো উপস্থিতির তালিকা, কখনো ফলাফল, আবার কখনো বিভিন্ন জিনিসের পরিমাণ বা পছন্দ। এই তথ্যগুলো শুধু সংগ্রহ করলেই হয় না, এগুলোকে সাজানো, বিশ্লেষণ করা এবং সহজভাবে তুলে ধরা দরকার। শিক্ষার্থীরা যখন উপাত্ত সংগ্রহ করে, সারণি বানায়, লেখচিত্র আঁকে এবং সেগুলো ব্যাখ্যা করতে শেখে, তখন তাদের মধ্যে বিশ্লেষণী চিন্তা, তুলনা করার দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে। এই উপাত্তের ধারনা, সংগ্রহ ও বিন্যাস এবং লেখচিত্র অঙ্কন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উপাত্ত (Data)

সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যকে উপাত্ত (ডাটা) বলে। অর্থাৎ উপাত্ত বলতে এমন সকল তথ্য, সংখ্যা, সত্য ও পর্যবেক্ষণকে বোঝায় যা কোনো বিষয় বিশ্লেষণ, তুলনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহৃত হয়। উপাত্ত দুই ধরনের হতে পারে-

১. **পরিমাণগত উপাত্ত (Quantitative Data)** : সংখ্যা বা মান দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন: বয়স, উচ্চতা ইত্যাদি।

২. **গুণগত উপাত্ত (Qualitative Data)**: বর্ণনামূলক তথ্য যেমন: রং, শ্রেণি, পছন্দের বিষয় ইত্যাদি। এ ধরনের উপাত্ত সাধারণত গবেষণা, জরিপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও গণনার কাজে ব্যবহার করা হয়।

উপাত্ত সারণিতে বিন্যস্তকরণ (Tabulation of Data)

যে উপাত্তগুলো কোনো বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো থাকে না সেগুলো অবিন্যস্ত উপাত্ত এবং যে উপাত্তগুলো কোনো বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে সাজানো থাকে সেগুলোকে বিন্যস্ত উপাত্ত বলে। যেমন:

২৫ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষা গণিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর নিচে উল্লেখ করা হলো:
৫৯, ৭২, ৭০, ৫২, ৬৯, ৪১, ৪৪, ৮৫, ৮৮, ৭৬, ৮০, ৫৮, ৮৯, ৮৫, ৯৬, ৮৪, ৭৮, ৭২, ৬৮, ৭৫, ৯৮, ৭৪, ৭৩, ৭৭, ৭১

এখানে উপাত্তগুলো কোনো বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো নয়। এগুলো অবিন্যস্ত উপাত্ত। উপাত্তগুলোকে সুবিধামতো সাজিয়ে নিলে তা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সহজ হয়। শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরসমূহের উপাত্তগুলোকে কৃতিত্বের ক্রম বা শ্রেণি অনুযায়ী সাজালে হবে বিন্যস্ত উপাত্ত।

উপাত্তকে নির্দিষ্ট ছকে সাজিয়ে সহজবোধ্য তালিকা বা সারণি তৈরি করাকে সারণিকরণ বলা হয়। সারণি তৈরিতে প্রথমে প্রত্যেক শ্রেণির দুইটি মানের মধ্যে পার্থক্য বা ব্যবধান বের করতে হবে। উপাত্তগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মান ৯৮ এবং সর্বনিম্ন মান ৪১। এখন সুবিধাজনক সংখ্যা ১০ কে শ্রেণি ব্যবধান ধরে ৪০ থেকে ১০০ পর্যন্ত নম্বরকে ১০ ব্যবধান করে সারণি তৈরি করি।

নম্বরের শ্রেণি ব্যবধান	ট্যালি চিহ্ন	ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
৪০-৪৯	॥	২
৫০-৫৯	|||	৩
৬০-৬৯	॥	২
৭০-৭৯	卌 卌	১০
৮০-৮৯	卌 ।	৬
৯০-৯৯	॥	২
	মোট =	**২৫**

এখানে সর্বনিম্ন স্কোর ৪১, শ্রেণি ব্যবধান ১০ নিয়ে ৪০ থেকে শ্রেণি ব্যবধান শুরু করা হয়েছে।

প্রথমে বাম পাশে শ্রেণি ব্যবধানগুলো লেখা হলো। সর্বনিম্ন সংখ্যা ৪১; এটি ৪০-৪৯ শ্রেণিতে বসল। সুতরাং ঐ শ্রেণিতে একটি ট্যালি চিহ্ন দেওয়া হলো। পরবর্তী নম্বর ৪৪, এটিও ৪০-৪৯ শ্রেণিতে বসল এবং ঐ শ্রেণিতে আরেকটি ট্যালি চিহ্ন দেওয়া হলো। এইভাবে পরবর্তী সংখ্যাগুলো সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে ট্যালি চিহ্ন দিয়ে সারণি সম্পূর্ণ করা হলো। ৭০-৭৯ শ্রেণিতে লক্ষ করা যায় যে, প্রথম চারটি ট্যালি চিহ্নের পর পঞ্চম ট্যালি বসানোর বেলায় পঞ্চম চিহ্নটি আলাদাভাবে পাশে না বসিয়ে চারটি চিহ্ন জুড়ে আড়াআড়িভাবে দেওয়া হয়েছে।

অনুশীলন

১। একটি এলাকার ২০টি পরিবারের মাসিক বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো। উপাত্তগুলো বিন্যস্ত করি।
৯৮০, ১১০০, ৯৫০, ১২৫০, ১০৮০, ১১৫০, ৯২০, ১৩০০, ১২০০, ১০৫০, ৯৮০, ১৪০০, ১২৫০, ১১০০, ১০২০, ১১৮০, ১২৫০, ৯৫০, ১৩৫০, ১২০০

২। একটি বাস কোম্পানির নির্দিষ্ট রুটে ২০ দিনের যাত্রীসংখ্যার তথ্য নিচে দেওয়া হলো। উপাত্তগুলো বিন্যস্ত করি।
৪৫, ৫২, ৪৮, ৬০, ৫৫, ৪২, ৫৮, ৬৩, ৫৫, ৪৯, ৫২, ৫৮, ৬০, ৪৫, ৫১, ৬৩, ৫৭, ৫৫, ৪৮, ৫০

লেখচিত্র (Graph/Chart) অঙ্কন:

সারণির উপাত্তকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তাকে লেখচিত্র বলে। লেখচিত্র উপস্থাপনাকে সহজ, আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে।

সাধারণ লেখচিত্রের ধরন

<table>
<tr><td>১। স্তম্ভলেখ: শ্রেণিভিত্তিক পরিবর্তন দেখাতে ব্যবহৃত হয়।</td><td>২। আয়তলেখ: অনেকগুলো শ্রেণি বা আইটেম তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়।</td></tr>
<tr><td>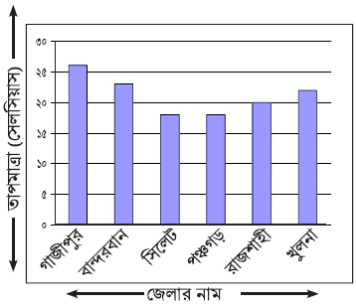
</td><td>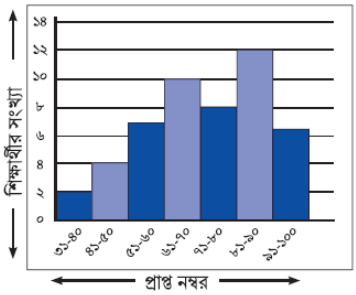
</td></tr>
<tr><td>৩। রেখাচিত্র: সময়ভিত্তিক পরিবর্তন প্রদর্শনে উপযোগী।</td><td>৪। পাই চার্ট: শতকরা হার বা অংশ প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়।</td></tr>
<tr><td>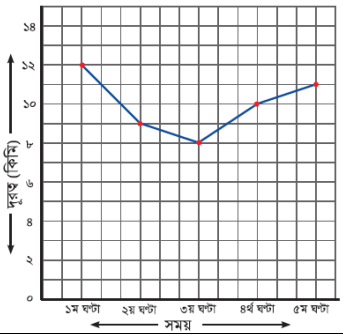
</td><td>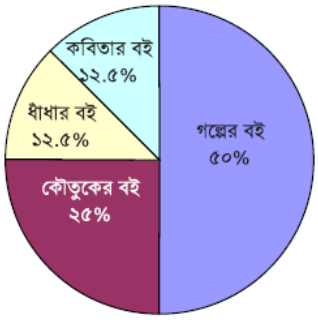
</td></tr>
</table>

উদাহরণ:

নিচের উপাত্তসমূহ একটি বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উচ্চতা নির্দেশ করে। এর জন্য সারণি তৈরি করি এবং প্রত্যেকটির জন্য স্তম্ভলেখ, রেখাচিত্র ও পাইচার্ট আঁকি।

শিক্ষার্থীদের উচ্চতা (সেন্টিমিটার)

১৩০, ১৩২, ১৩৪, ১২৮, ১২১, ১২৩ ১৩৮, ১২৪, ১৩৪, ১৩৯, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৮, ১২৩, ১২৬, ১৩০, ১৩১, ১৩৭, ১৩৫, ১২১, ১২৫, ১৩১, ১৩৪, ১৩৩, ১৪১, ১২৯, ১৩৩, ১২৬, ১২৮

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান

- সর্বোচ্চ উচ্চতা = ১৪১ সেমি
- সর্বনিম্ন উচ্চতা = ১২১ সেমি

পার্থক্য = ১৪১ – ১২১ = ২০ + ১ = ২১ সেমি

সুবিধাজনক শ্রেণি ব্যবধান = ৫

সারণি:

উচ্চতা (সেমি)	ট্যালি চিহ্ন	শিক্ষার্থী সংখ্যা
১২০-১২৪	𝍸 । ।	৭
১২৫-১২৯	𝍸 । । ।	৮
১৩০-১৩৪	𝍸 𝍸	১০
১৩৫-১৩৯	। । । ।	৪
১৪০-১৪৪	।	১
	মোট =	**৩০**

স্তম্ভলেখ	রেখাচিত্র	পাই চার্ট
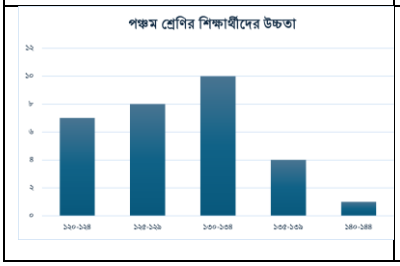	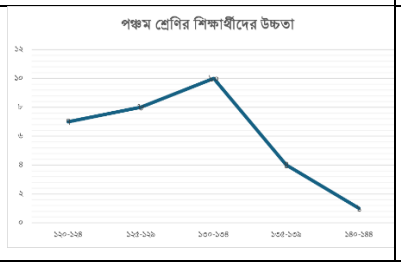	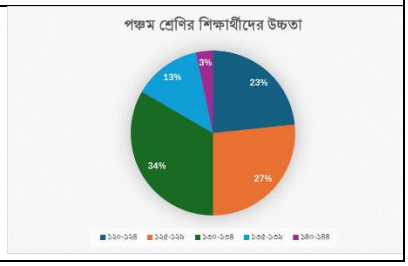

উপাত্ত সম্পর্কিত সমস্যা

১। উপাত্তগুলো শ্রেণিবদ্ধ করে ট্যালি চিহ্নসহ সারণি তৈরি করি এবং একটি আয়তলেখ অঙ্কন করি।

শিক্ষার্থীদের ওজন (কেজি):

৪০, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫১, ৪৯, ৪৩, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৪৭, ৪৬, ৫২

২। উপাত্তগুলো শ্রেণি ব্যবধান ৫ ধরে ট্যালি চিহ্নসহ একটি সারণি তৈরি করি এবং একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করি।

দোকানে প্রতিদিন বিক্রি হওয়া ডিমের সংখ্যা:

৮০, ৯২, ৮৫, ৮৮, ৯৫, ১০০, ৯৮, ৯২, ৮৭, ৯০, ১০২, ৮৫, ৮০, ৮৪, ৮৮, ৯৬, ৯৮, ৯০, ৯২, ১০৫

উপাত্ত বিন্যস্তকরণ ও লেখচিত্র শিখন-শেখানো কৌশল

উপাত্ত বিন্যস্তকরণ ও লেখচিত্র উপস্থাপন এমন একটি দক্ষতা, যা শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা, যৌক্তিক চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা গড়ে তোলে। শিক্ষক যখন উপাত্ত সাজানো থেকে শুরু করে আয়তলেখ, স্তম্ভলেখ, রেখাচিত্র বা পাই চার্ট তৈরি করা পর্যন্ত ধাপে ধাপে দেখান, তখন শিক্ষার্থীরা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি সহজে আয়ত্ত করতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে উপাত্ত বিন্যস্তকরণ ও লেখচিত্র শেখানোর জন্য একজন শিক্ষক ধাপে ধাপে পরিকল্পিত, আকর্ষণীয় ও কার্যকর কিছু উপায় ব্যবহার করতে পারেন। নিচে সহজ, বাস্তবসম্মত ও প্রাযুক্তিকভাবে কার্যকর ধাপগুলো দেওয়া হলো:

১) বাস্তব উদাহরণ দিয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা। যেমন: শিক্ষার্থীদের উচ্চতা/বয়স, শ্রেণির উপস্থিতি, বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর ইত্যাদি।

২) শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপাত্তগুলো ক্রমানুসারে সাজাতে বলা। এটি উপাত্ত বিন্যস্তকরণের প্রথম ধাপ। এর মাধ্যমে তারা সবচেয়ে ছোট মান, সবচেয়ে বড় মান এবং পুনরাবৃত্ত সংখ্যা চিহ্নিত করতে শিখবে।

৩) যদি উপাত্ত বেশি হয়, তখন শিক্ষক দেখাবেন, কীভাবে ৫ বা ১০ করে শ্রেণি ব্যবধান বানানো যায়।

৪) ট্যালি চিহ্নের ব্যবহার হাতে কলমে বা বোর্ডে একে শেখানো। এরপর শ্রেণি ব্যবধান, ট্যালি এগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ একটি সুশৃঙ্খল টেবিল তৈরি করে দেখানো। এটি পরবর্তী লেখচিত্রের ভিত্তি তৈরি করে।

৫) উপাত্তের ধরন অনুযায়ী কোন লেখচিত্র সবচেয়ে উপযুক্ত তা ব্যাখ্যা করা। যেমন- তুলনার জন্য স্তম্ভলেখ বা আয়তলেখ, সময়ক্রমিক পরিবর্তনের জন্য রেখা চিত্র, অংশ সম্পর্ক বোঝাতে পাই চার্ট ইত্যাদি।

৬) বোর্ডে লেখচিত্র আঁকা শেখানো। এক্ষেত্রে ধাপে ধাপে দেখাতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখচিত্র তৈরি করাতে হবে। শিক্ষার্থীরা তৈরি করা লেখচিত্র থেকে যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেমন: কোন মান বেশি? কোনটি কম? কী ধরণের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে? এভাবেই "Data Interpretation" দক্ষতা গড়ে ওঠে।

৭) সবশেষে বাস্তব জীবনের প্রয়োগ দেখানো। যেমন: সংবাদপত্রে ব্যবহৃত গ্রাফ, আবহাওয়া দপ্তরের চার্ট, ব্যবসা-বাণিজ্যে উপাত্ত বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

অধ্যায় ১৩
গণিত শিক্ষা উপকরণ

শিখন কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত করে তুলতে শিক্ষোপকরণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণিত শুধুমাত্র সংখ্যা ও সূত্রের বিষয় নয়। এটি একটি বিমূর্ত ও যৌক্তিক চিন্তার বিজ্ঞান। প্রাথমিক স্তরের শিশুরা মূলত মূর্ত ও দৃশ্যমান বস্তু দিয়ে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। তাই তাদের কাছে গণিতের জটিল ও বিমূর্ত ধারণাগুলোকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য শিক্ষা উপকরণ (Teaching Aids) অপরিহার্য একটি মাধ্যম। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে যেসব বস্তু বা শিখন সামগ্রী ব্যবহার করা হয় সেগুলোকেই শিক্ষা উপকরণ বলা হয়। সবচেয়ে পরিচিত এবং ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এ ছাড়া শ্রেণিকক্ষে সাধারণভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য যেমন: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, চক, চকবোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদিও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ। কিন্তু যদি কোন বিষয়ের শিখন কার্যক্রমে সে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বিশেষ উপকরণ বলা হয়। গণিত-এর কোন বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রমে সে বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষ উপকরণ ব্যবহার করা হলে সেগুলোই গণিত শিক্ষা উপকরণ। শিক্ষোপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি মনোযোগী করে তোলা যায়, কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধন করা যায়, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল করা যায়। প্রাথমিক স্তরে একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো শিশুর মনে গণিতের প্রতি একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং গাণিতিক ভিত্তি মজবুত করা। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে শিক্ষা উপকরণ হলো শিক্ষকের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও কার্যকর সহায়ক। তাই এই অধ্যায়ে গণিত শিক্ষোপকরণের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষোপকরণ তৈরি ও ব্যবহার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষোপকরণের গুরুত্ব

শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য বাস্তব উপকরণের প্রয়োজন বেশি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট গাণিতিক ধারণা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে যথাযথ বাস্তব উপকরণ নাড়াচাড়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তার মাঝে গাণিতিক ধারণার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠতে পারে। আমাদের চারপাশে অনেক উপকরণ যা ব্যবহার করে শিশু মনকে নাড়া দেওয়া যায় এবং তাদের মধ্যে শেখার আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। বাস্তব উপকরণ নাড়াচাড়া ও গণনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গাণিতিক ধারণা জন্মে। গণিত একটি বিমূর্ত ধারণা। কাজেই জটিল ও বিমূর্ত গাণিতিক ধারণাকে শিক্ষার্থীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করার জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন উপকরণের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিবেশ থেকে সংগৃহীত উপকরণের সাহায্যে গণিতের নতুন কোন ধারণা উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীর নিকট সেটা হয় চিত্তাকর্ষক ও গ্রহণযোগ্য। শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণের মধামে শিক্ষাদান শিক্ষার্থীদের গাণিতিক ধারণাকে সুস্পষ্ট করে, গণিতভীতি দূর করে এবং গণিতকে সহজবোধ্য করে তোলে।

গণিত শিখন শেখানোয় উপকরণের প্রয়োজনীতা:

গণিত শিক্ষাকে জীবনমুখী ও বাস্তবভিত্তিক করতে শিক্ষোপকরণের কোন বিকল্প নেই। উপকরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাণিতিক ধারণাগুলোকে স্পষ্ট, প্রাণবন্ত ও দৃশ্যমান চিত্র তৈরি করে, যা তাদের গভীরভাবে বুঝতে এবং স্মরণ রাখতে সহায়তা করে। নিম্নে গণিত শিক্ষা উপকরণের কিছু প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো।

১. বিমূর্ত ধারণাকে বাস্তব রূপদান: বর্গ, ঘন, ভগ্নাংশ, জ্যামিতিক উপপাদ্য, উপাত্ত বিশ্লেষণের মতো বিমূর্ত ধারণাগুলো কেবল সূত্র, সংজ্ঞা কাগজে-কলমে মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে। কাগজ কেটে, জ্যামিতিক বক্স বা ব্লক ব্যবহার করে, বা ইন্টারেক্টিভ সফটওয়্যারের মাধ্যমে দেখলে, ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পেলে ধারণাগুলো শিক্ষার্থীর মনে গভীর ও স্থায়ী ছাপ রাখে।

২. শিক্ষার্থীকে চিন্তনের সুযোগের জন্য: গণিতের শিক্ষোপকরণ কেবল আনন্দই দেয় না, এটি শিক্ষার্থীর চিন্তনশক্তিরও বিকাশ ঘটায়। এর মাধ্যমে তারা পর্যবেক্ষণ (প্যাটার্ন দেখা), বিশ্লেষণ (কেন ১/২ + ১/৩ = ?) সংশ্লেষণ (নিজে নতুন আকৃতি তৈরি) যুক্তি প্রদর্শনের মতো জটিল মানসিক দক্ষতা অর্জন করে।

৩. গণিতে একঘেয়েমি দূরীকরণ ও আগ্রহ সৃষ্টি: নিয়মিত গণিত অনুশীলনে একঘেয়েমি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু উপকরণ ব্যবহার করে যেমন: কাগজ কেটে, জ্যামিতিক বক্স বা ব্লক ব্যবহার করে যোগ-বিয়োগ, ভগ্নাংশ, বা ত্রিভুজের কোণের সমষ্টির মতো বিষয়গুলো যখন রঙিন ব্লক, পাজল বা হাতে-কলমে মডেলের মাধ্যমে শেখানো হয়, তখন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ বহুগুণে বেড়ে যায়। এটি শিখনকে করে তোলে আনন্দময় এবং গাণিতিক আচরণে (সমস্যা সমাধানের দক্ষতা) দ্রুত ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

৪. গণিত শিক্ষণ পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনা: মডেল, চার্ট, ডিজিটাল সরঞ্জাম ও গেমস এই সমস্ত শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতের ক্লাসরুমে বৈচিত্র্য আসে। এই বৈচিত্র্য ক্লাসকে সজীব ও গতিশীল রাখে, ফলে শিক্ষার্থীরা পুরো সময়ই সক্রিয় ও সজাগ থাকে, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষকে ভালবাসে এবং দিনে দিনে কৌতুহলী হয়ে ওঠে।

৫. গণিত শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ: শিক্ষোপকরণ শিক্ষার্থীকে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা থাকতে দেয় না। তারা নিজেরা হাতে-কলমে কাজ করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং আবিষ্কারের মাধ্যমে শেখে। এভাবে শিক্ষণ প্রক্রিয়া একমুখী নির্দেশনার বদলে হয়ে ওঠে একটি আন্তঃক্রিয়ামূলক কার্যক্রম।

৬. মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি জন্য: রঙিন ব্লক, জিগস পাজল, গণিতের গেম, ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং গণিতের প্রতি একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। এতে শিক্ষার্থী নিজে থেকেই শিখতে আগ্রহী হয়।

৭. দীর্ঘস্থায়ী শিখন নিশ্চিতকরণ: গনিতের বিভিন্ন সমস্যা শিক্ষার্থী যদি না বুঝে শুধু মুখস্থ করলে তা দ্রুতই ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই শিখনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য উপকরণের ব্যবহার প্রয়োজন।আমরা যা দেখি, শুনি এবং করি, তা আমরা বেশি দিন মনে রাখি। শিক্ষোপকরণের ব্যবহার শিক্ষার্থীর বহু ইন্দ্রিয়কে (দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ) সম্পৃক্ত করে বলে শেখাটা হয় বেশি কার্যকর ও স্থায়ী।

৮. জটিল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি: অ্যাবাকাস বা ফ্লোচার্টের মতো শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেকোনো জটিল সমস্যাকে ছোট ছোট যৌক্তিক ধাপে ভাগ করে সমাধান করার কৌশল রপ্ত করে। এই প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও গাণিতিক যুক্তির দক্ষতা গড়ে তোলে।

৯. শিক্ষকের জন্য সহায়ক: একটি ভালো উপকরণ শিক্ষকের জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এটি শিক্ষককে গণিতের জটিল বিষয় খুব অল্প সময়েই সহজ, সাবলীল ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে, ফলে পুরো পাঠ্যসূচি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্য।

গণিত শিক্ষা উপকরণের ধরন

গণিত শিক্ষায় ব্যবহৃত উপকরণগুলিকে তাদের প্রকৃতি, উপস্থাপনের পদ্ধতি এবং ব্যবহারের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। নিচে সবচেয়ে ব্যবহারিক কয়েকটি শ্রেণির উপকরণের নাম দেওয়া হলো।

বাস্তব উপকরণ: এই ধরণের উপকরণ শিক্ষার্থীরা হাতে স্পর্শ করতে পারে, নাড়াচাড়া করতে পারে এর মধ্যে কিছু উপকরণ সহজেই সংগ্রহ করা যায় যেমন- পাতা, কাঠি, দড়ি, পাথর, বোতলের ঢাকনা, মুদ্রা, ফল, বল, বিভিন্ন আকারের বক্স ইত্যাদি। কিছু কিছু উপকরণ তৈরি করে ব্যবহার করা হয় যেমন- অ্যাবাকাস, নম্বর কার্ড, জ্যামিতিক আকার মডেল (ত্রিভুজ, বর্গ, ঘনক), সংখ্যার রেখা, ভগ্নাংশ ডিস্ক, ডমিনো, জিওবোর্ড ইত্যাদি।

ছবি-চিত্র ও চার্ট: যেগুলো দেখে শিক্ষার্থীরা ধারণা তৈরি করতে পারে । যেমন-সংখ্যাক্রম চার্ট, গুণনীয়ক-গুণিতক চার্ট, নামতার চার্ট, সময়-পরিমাপ চার্ট, ভগ্নাংশ চার্ট, জ্যামিতিক আকার, পরিমাপের একক, আকার সনাক্তকরণের ছবি, সমান ভাগের চিত্র (ভগ্নাংশ) ইত্যাদি।

প্রতীকী মূলক শিক্ষা উপকরণ:

বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে রক্ষিত গণিতের বিভিন্ন প্রকার সহায়ক পুস্তক অথবা শিক্ষাদানের জন্য মুদ্রিত হ্যান্ড-নোট, লিফলেট বা কোন নির্দেশনা- ইত্যাদি হচ্ছে প্রতীকী মূলক শিক্ষা উপকরণ। এদের আমরা কখনও কখনও শিখন সামগ্রী

(Instructional Materials) হিসাবেও উল্লেখ করি। গণিত সাময়িকী, গণিতের ইতিহাস সম্পর্কিত বই, গণিত বিষয়ক বুলেটিন, গণিত বা পরিসংখ্যান জাতীয় যে কোন সরকারি বা বেসরকারি পত্রিকা বুলেটিন ইত্যাদি প্রতীকীমূলক উপকরণের উদাহরণ।

অনুসন্ধানমূলক উপকরণ: যেসব উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা বা সমস্যার সমাধানে উপনীত হতে পারে তাকে অনুসন্ধানমূলক উপকরণ বলে। যেমন: এ্যাবাকাস, ফুট স্কেল, মিটার স্কেল, চাঁদা (কোণ মাপনী), স্লাইড রুল, ক্যালকুলেটর, জ্যামিতি বক্স।

গণিতের বিষয়বস্তুর চাহিদামাফিক বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সনাক্তকরণ

(১) সংখ্যা ও সংখ্যা প্রক্রিয়া শেখানোর জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহার করতে পারিঃ

- গণনার বস্তু, মার্বেল, মাটিরতৈরী বল, নুড়ি পাথরের টুকরো, পীচবোর্ড বা হার্ডবোর্ড কেঁটে তৈরী বিভিন্ন জ্যামিতিক
- ক্ষেত্র বা চিত্র বাঁশের কাঠের টুকরো, কাঠির বান্ডিল, স্কেল, পাতা ফুল, ফল ইত্যাদি।
- এ্যাবাকাস, ক্যালকুলেটর।
- বিভিন্ন আকারের (কাঠের) ঘনবস্তু। প্ল্যাইউড, তক্তা, হার্ডবোর্ড।
- মিটার স্কেল, ওজন যন্ত্র, ফুট স্কেল ইত্যাদি।

(২) সাধারণ ও দশমিক ভগ্নাংশ শেখানোর জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহার করতে পারিঃ

- ফ্লানেল বোর্ড বা ফ্লানেল কাপড়ের সুবিধাজনক টুকরো।
- পীচ বা কাঠের কাটা বৃত্ত, চতুর্ভুজ, আয়তক্ষেত্র ইত্যাদি যাতে অর্ধাংশ, এক তৃতীয়াংশ ইত্যাদি দেখান সম্ভব।
- পোস্টার বা কাগজে অঙ্কিত বিভিন্ন ভগ্নাংশের চার্ট।
- ফুট স্কেল, মিটার স্কেল (দশমাংশ দাগাঙ্কিত)

(৩) বিভিন্ন প্রকার জ্যামিতিক ধারণার জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহার করতে পারিঃ

- কাঠ বা কাগজের তৈরি বিভিন্ন আকৃতির ঘনবস্তুর মডেল।
- হার্ডবোর্ড বা কাগজের তৈরি ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ইত্যাদি জ্যামিতিক ক্ষেত্র।
- জ্যামিতি বক্স, ড্রয়িং বোর্ড।
- ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি তৈরির জন্য দড়ি বা কাঠি।
- জ্যামিতিক চিত্রের চার্ট।
- গ্রাফ বোর্ড।

(৪) বিভিন্ন প্রকার পরিমাপের জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহার করতে পারিঃ

- দৈর্ঘ্য পরিমাপের উপকরণ: মিটার স্কেল, ফুট স্কেল, গজ ফিতা, টেপ।
- ক্ষেত্রফল পরিমাপের জন্য পীচ বোর্ডের তৈরী ১ ইঞ্চি, এক বর্গফুট, ১ বর্গসেন্টিমিটার বিশিষ্ট ক্ষেত্র।
- ঘনক: ১ ঘন ইঞ্চি, ১ ঘন সেন্টিমিটার, ১ ঘন ফুট ইত্যাদি পরিমাপের কাঠের বা কাগজের তৈরী ঘনক।
- সময় পরিমাপের উপকরণ: ঘড়ি।
- ওজন পরিমাপের উপকরণ: পাল্লা, বাটখাড়া, নিক্তি।
- মুদ্রা: বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা (দেশীয় ও বিভিন্ন দেশের)
- তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্রাদি।
- তরল পদার্থ পরিমাপের উপকরণ: ১ লিটার, ১ গ্যালন আয়তন বিশিষ্ট পাত্র।

গণিত শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার কৌশল

স্বল্প ব্যয়ে ও বিনামূল্যে গণিতে শিক্ষা উপকরণ তৈরি

কার্যকর, ফলপ্রসূ ও আদন্দদায়কভাবে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য শিক্ষা উপকরণের কোন বিকল্প নাই। গাণিতিক ধ্যান-ধারণা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের সময় বাস্তব ও অর্ধবাস্তব পর্যায়ে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়। গণিত এমন একটি বিষয় যা মুখে মুখে পড়ানোর চেয়ে উপকরণের সাহায্যে পড়ালে বেশি কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়। বাস্তব উপকরণের মাধ্যমে গণিতের যে কোন বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করলে কিংবা ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ছোট কোমলমতী শিশুদের প্রয়োজনীয় উপকরণ ছাড়া প্রকৃত গাণিতিক ধারণা দেওয়া সম্ভবই নয়।

বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এবং চারপাশে যা কিছু আছে প্রায় সবকিছু-কে গণিতের কোন না কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করা যায় এবং এগুলো সবই বিনামূল্যে গণিত শিক্ষা উপকরণ। এসব চারপাশের গণিত শিক্ষা উপকরণকে শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে গণিত শিখন কার্যক্রম আনন্দদায়ক ও কার্যকর করা সম্ভব। শিক্ষক নিজেও প্রয়োজন অনুযায়ী স্বল্পমূল্যের বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়েও বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করাতে পারেন। শিক্ষা উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের ও চিন্তা করতে হবে। স্বল্প ব্যয়ে ও বিনামূল্যে গণিতে প্রচুর শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা সম্ভব। যেমন, সংখ্যা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, গুণিতক, গুণনীয়ক, ভগ্নাংশ ইত্যাদির ধারণা উপস্থাপনের সময় পরিবেশ থেকে সংগৃহীত সহজলভ্য উপকরণ। এ ছাড়া বিভিন্ন অনলাইন ও অফলাইন গণিত সফটওয়্যার এবং গণিত ওয়েবসাইট গণিত শিখন কার্যক্রমে অনেক চমৎকার এবং আকর্ষণীয় উপকরণ হিসাবে কাজ করে।

কাগজ ভাঁজ করা

কাগজ ভাঁজ করে বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা ব্যাখ্যা করা যায় এবং বিভিন্ন গাণিতিক মডেলও তৈরি করা যায়। রঙিন কাগজ ভাঁজ করে গাণিতিক ধারণা ব্যাখ্যা করলে ধারণাগুলো শিক্ষার্থীর কাছে মূর্ত হয়ে উঠে এবং শিক্ষার্থী ও কাগজ ভাঁজে উদ্বুদ্ধ হয়। এতে আনন্দ ও আগ্রহের সাথে শিক্ষার্থীর মানসিক, মৌলিক, সৃজনশীল ও যৌক্তিক চিন্তার বিকাশ ঘটে।

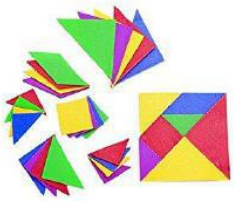

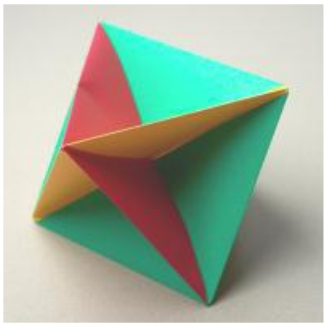

গণিত শিক্ষা উপকরণের কিছু ধারণা নিচের ছবিগুলোর মাধ্যমে দেয়া হলো। এগুলো কাগজ বা হার্ডবোর্ড দিয়ে খুব সহজে তৈরি করা সম্ভব।

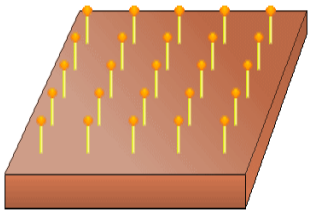

জিওবোর্ড

ট্যানগ্রাম

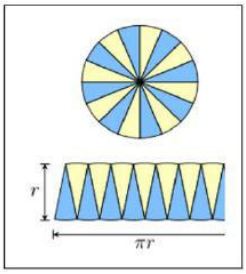

বৃত্তের ক্ষেত্রফল

দড়ি ও কাঠি দিয়ে আকৃতি তৈরি

দড়ি/কাঠি দিয়ে আকৃতি তৈরি- পাশের চিত্রের মত করে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ১৩ গিটের সুতার সাহায্যে এবং বিভিন্ন মাপের কাঠির দিয়ে জ্যামিতিক আকৃতি তৈরি করা যায়

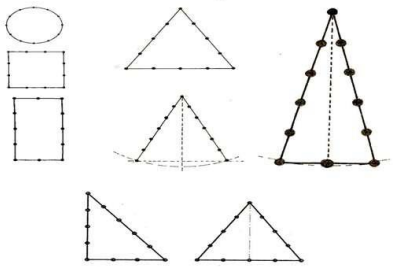

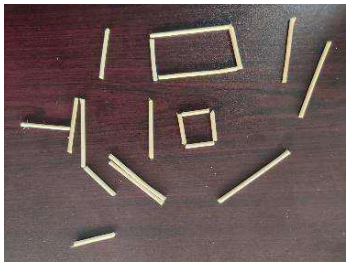

লুডুর ঘর ও ছক্কা

লুডু দিয়ে সংখ্যার যোগ বিয়োগের বোর্ড তৈরি – নিচের চিত্রের মত করে কাগজ দিয়ে লুডু তৈরি করে শিক্ষার্থীদের যোগ-বিয়োগ অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করা যায়।

					←	←	←	←	শুরু
শুরু	→	→	→	→	→				

গণিত শিখন কার্যক্রমে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার কৌশল:

- উপকরণ অবশ্যই পাঠের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।
- কোন কাজে কখন কোন উপকরণ ব্যবহার করবেন পূর্বেই তার পরিকল্পনা করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর কাছে উপকরণ দেয়ার পর তারা কি করবে সে সম্পর্কে অবশ্যই সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।
- শিক্ষার্থী উপকরণ নিয়ে নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করছে কিনা তা অবশ্যই শিক্ষককে মনিটর করতে হবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করতে হবে।
- সব শিক্ষার্থী প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা যেন কোন উপকরণ অগোছালোভাবে শ্রেণির কোথাও না ফেলে সে নির্দেশনাও দিতে হবে।
- ব্যবহার শেষে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই উপকরণগুলো গুছিয়ে শিক্ষকের কাছে রাখবে।
- উপকরণের কোন চার্ট টাঙ্গানো হলে কাজ শেষে তা নামিয়ে রাখতে পারেন।
- চার্টের সাইজ অবশ্যই শ্রেণি উপযোগী হতে হবে।
- শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী অবশ্যই পর্যাপ্ত উপকরণ নিয়ে যেতে হবে।
- উপকরণ আকর্ষণীয় হতে হবে যেন শিক্ষাথীর আগ্রহ ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।
- উপকরণ এমন হবে যেন শিক্ষার্থীর গাণিতিক চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- উপকরণের আধিক্যে যেন কোনভাবেই পাঠের আসল উদ্দেশ্য ব্যহত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ

শিক্ষা উপকরণ তৈরি কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একজন আদর্শ গণিত শিক্ষক প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝেও এ কষ্টসাধ্য কাজটি নিজে করে থাকেন এবং শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহার করেন। কিন্তু তৈরিকৃত উপকরণ যদি প্রয়োজনীয় যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা না হয় তবে শিক্ষকের সমস্ত কষ্ট সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। গণিত শিখন কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার জন্য গণিত শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তৈরী উপকরণ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করাও অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে প্রশাসনের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপকরণ সংরক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে একটি কর্নার বা একটি কক্ষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাজিয়ে রাখার জন্য আলমারি বা রেকের ব্যবস্থা থাকবে। উপকরণগুলো সেখানে রাখা এবং সেখান থেকে নেয়ার একটি নীতিমালা করা যেতে পারে যাতে সবাই যত্নের সহিত সেগুলো ব্যবহার করে। এভাবে উপকরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে উপকরণ তৈরির আগ্রহ অনেক বেড়ে যাবে। এবং কয়েক বছর পর দেখা যাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে গণিত উপকরণ কক্ষ তৈরি হয়ে গেছে।

অনুশীলন

১. ২য় শ্রেণিতে সংখ্যা ও সংখ্যা প্রক্রিয়া শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্পমূল্যের ও বিনামূল্যের উপকরণ সমূহের নাম লিখি।

২. ৩য় শ্রেণিতে সংখ্যা ও সংখ্যা প্রক্রিয়া শেখানোর ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা স্বল্পমূল্যের ও বিনামূল্যের শিক্ষা উপকণের নমুনা তৈরি করি।

৩. ৪র্থ শ্রেণিতে জ্যমিতি শেখানোর জন্য ব্যবহারযোগ্য স্বল্পমূল্যের ও বিনামূল্যেপ্রাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সমূহের নাম লিখি।

৪. ৫ম শ্রেণিতে জ্যমিতি শেখানোর ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী প্রয়োগ করে স্বল্পমূল্যের ও বিনামূল্যের কম পক্ষে তিনটি শিক্ষা উপকরণ তৈরি করি।

অধ্যায় ১৪
গণিত শিখন মূল্যায়ন

গণিত শিখন মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূর্বে গণিত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর কাজ ছিল শিক্ষককে অনুকরণ করা বা শিক্ষকের নির্দেশনার আলোকে অনুশীলন করা। কিন্তু আধুনিক শিখন শেখানোর ধারায় বিবিধ কৌশল নিহিত রয়েছে, যেমন সমস্যা সমাধান, অনুসন্ধান বা গবেষণা, ব্যবহারিক কাজ প্রভৃতি। তাই গণিত শিক্ষার এ পরিবর্তনের ধারায় মূল্যায়ন পদ্ধতিকে আরও সমৃদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে প্রায়ই দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের ভুলভ্রান্তিকে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্ষমতার অভাব বা প্রচেষ্টার অভাব বলে ধরে নেন। শিক্ষক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অভিমত বা চিন্তাকে আমলে নেন না। যার কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই পরবর্তী শিখনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী যাতে গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করার জন্য উৎসাহিত হয় সেজন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি গাঠনিক মূল্যায়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে গণিত শিখন মূল্যায়নের ধারণা, মূল্যায়নের ধরন, মূল্যায়নের বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ও কৌশল, গণিত শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়ন টুলস প্রণয়ন ও ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে তার শিখনে সহায়তা করা। বাস্তবতার নিরিখে মূল্যায়নের ফলাফল যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, (ক) শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিখনে সহায়তা করা; (খ) শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড সংরক্ষণ ও পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া এবং (গ) শিক্ষকের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মানোন্নয়ন করা।

আবার, শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের বেশ কিছু গুরুত্বও রয়েছে। যেমন, বিদ্যালয় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই ফলাফল সামগ্রিকভাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিক্ষার লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা বোঝা যায় এই মূল্যায়নের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর গ্রেড, তার অবস্থান, অগ্রগতি, শিখন চাহিদা, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি সবকিছুর ওপর মূল্যায়নের প্রভাব রয়েছে।

শিখন মূল্যায়নের ধরন: ধারাবাহিক মূল্যায়ন

ধারাবাহিক মূল্যায়ন হলো শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন। এটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির অংশ হিসেবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন অনুষ্ঠিত হবে, প্রান্তিক শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে নয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল ও কাজ দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থী কী জানে, বুঝে বা করতে পারে সে সম্পর্কে শিক্ষক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন। এর ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কে পিছিয়ে আছে এবং কে এগিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন এবং এর ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দিবেন ও তার শিখন নিশ্চিত করবেন।

শিখন মূল্যায়নের ধরন: সামষ্টিক মূল্যায়ন

সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুষ্ঠিত হয়, এবং তা শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ নয়। সাধারণত কোনো প্রান্তিকের শেষে বা শিক্ষাবর্ষ শেষে এ ধরনের মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো একটি সুনির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থী কী শিখেছে এবং কতটুকু শিখেছে তা জানা। সামষ্টিক মূল্যায়নে ফলাবর্তনের সুযোগ থাকেনা।

প্রাথমিক স্তরে প্রতি প্রান্তিকের শেষে নির্ধারিত সময়ে সামষ্টিক মূল্যায়ন সংঘটিত হয়। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদের পর (১ম/২য়/৩য় প্রান্তিকের শেষে) নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার (বা শিখনফলের) ভিত্তিতে ঐ মেয়াদের মধ্যে পঠিত সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অর্জন বা শিখনফল মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়াই হলো সামষ্টিক মূল্যায়ন।

গণিত শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্র

সকল শিক্ষার্থীর গাণিতিক সাক্ষরতা অর্জন ও গণিতের জ্ঞান কে সুদৃঢ় করার জন্য গণিত শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। তাই শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে জন্য শুরুতেই নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করা যেতে পারে;

- গণিত শিখন মূল্যায়নে কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত? কেন?
- গণিত শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো কী?
- শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নে ক্ষেত্রগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হবে?

গণিত শিখন মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়

গণিত শিখন মূল্যায়নে কয়েকটি মৌলিক বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর গণিতের নিয়ম, নীতি ও ধারণা কেবল মুখস্থ নয়, বরং কেন ও কীভাবে কাজ করে তা কতটা অনুধাবন করেছে, তা বিবেচনা করে মূল্যায়ন করতে হবে। পাশাপাশি প্রক্রিয়াগত ধারণা, সমস্যা সমাধান দক্ষতা মূল্যায়ন করতে হয়, অর্থাৎ তারা গণনার ধাপ, সূত্র প্রয়োগ এবং সমাধান প্রক্রিয়া কতটা সঠিকভাবে অনুসরণ করছে এবং যৌক্তিকভাবে সমাধানে করতে পারছে কিনা তা যাচাই করা অপরিহার্য। এ ছাড়া বিশ্লেষণ, তুলনা, যুক্তি প্রদর্শন ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সক্ষমতা বিবেচনা করে মূল্যায়ন করতে হয়।

গাণিতিক দক্ষতা মূল্যয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ দক্ষতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী তার সমাধান ভাষা, চিত্র বা প্রতীকের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কিনা, বিভিন্ন উপস্থাপন পদ্ধতি যেমন গ্রাফ, টেবিল, জ্যামিতিক চিত্র বা মডেল ব্যবহার করে ধারণা প্রকাশের সক্ষমতা আছে কিনা, গণিত শেখার প্রতি মনোভাব, আগ্রহ আত্মবিশ্বাস আছে কিনা, ইত্যাদি।

গণিত শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্র

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গাণিতিক ধারণা (Mathematical Conceptual Knowledge) : শিক্ষার্থীদের পূর্বে শেখা সুনির্দিষ্ট/ সর্বজনীন কোনো কিছু (সংজ্ঞা, ঘটনা, প্রক্রিয়া, তত্ত্ব ইত্যাদি) স্মরণ করার মানসিক প্রক্রিয়াই হলো গাণিতিক ধারণাগত জ্ঞান (MCK)। এছাড়াও গাণিতিক ধারণাগত জ্ঞান হলো দৈনন্দিন গাণিতিক প্রয়োজনে বা কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধানে কী করতে হবে তা বুঝতে পারা।
উদাহরণস্বরূপ: সনাক্ত করা, স্মরণ করা, পূনরায় করা, গণনা করা, তুলনা করা, পার্থক্য করা, সংখ্যার ছোট-বড় চিনতে পারা, পূনঃউপস্থাপন করা, প্রতিলিপি করা ইত্যাদি। যেমন, ৭ এর ঘরের নামতা বলি? অথবা সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কী? ইত্যাদি।

প্রক্রিয়াগত ধারণা (Procedural knowledge): শিক্ষার্থীর গণিতের বিষয়বস্তু/তথ্যসমূহ উপলব্ধি করে দৈনন্দিন গাণিতিক প্রয়োজনে বা গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যে প্রক্রিয়া/কৌশল ব্যবহার করতে হবে তা নির্ধারণ করতে পারাই হচ্ছে গণিতের প্রক্রিয়াগত ধারণা। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে গাণিতিক সমস্যার সমাধানের কৌশল (কোনটি, কীভাবে করতে হবে তা) সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা।
উদাহরণস্বরূপ: বর্ণনা করা, ব্যাখ্য করা, পার্থক্য নির্ণয় করা, উদাহরণ দেয়া, শ্রেণিকরণ করা, উপযুক্তটি বেছে নেয়া ইত্যাদি। যেমন, ১৪ ও ৩৬ লসাগু কত অথবা ৫,৮,১২,১৫ ও ২০ এর গড় কত? উপযুক্ত প্রক্রিয়া মেনে ফলাফল করতে পারা।

সমস্যা সমাধান (Problem solving): শিক্ষার্থীদের গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগত ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা, বাস্তব জীবনের সাথে মিল করে গাণিতিক সমস্যা তৈরি করতে পারা এ স্তরের কাজ। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের গণিতের কোনো ধারণা, পদ্ধতি, সূত্র বা কোনো অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে বা নতুন পরিস্থিতিতে কাজে লাগানোর ক্ষমতাই হলো সমস্যা সমাধান বা প্রয়োগ দক্ষতা।

উদাহরণ স্বরূপ; গণিতের ক্ষেত্রে হিসাব-নিকাশ করা, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা, সম্পর্ক দেখানো, চিত্র অঙ্কন করা, সমস্যা সমাধান করা ইত্যাদি। যেমন; ২০০ টাকায় ১০০টি দরে লিচু কিনে ২২০ টাকা দরে প্রতিশত লিচু বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?

গণিত বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কৌশল

শ্রেণি শিক্ষককে সুচারুরূপে ধারাবাহিক মূল্যায়নভিত্তিক পাঠ পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য নিচে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোটিতে মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী ধারাবাহিক মূল্যায়ন কৌশল

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	উপকরণ (টুলস)	উদাহরণ
গাণিতিক ধারণা	• সংখ্যার ধারণা। • গাণিতিক সমস্যা সমাধানে কোন ধরনের গাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে তা বুঝতে পারা। যেমন, বেশি হওয়া-কম হওয়া, ছোট হওয়া-বড় হওয়া, দূরে-কাছে, অপরিবর্তীত থাকা, বস্তুর আলোকে পরিমাপের একক, জ্যামিতিক আকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা। • গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে কোন কোন গাণিতিক প্রক্রিয়া (যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ) ব্যবহার	মৌখিক	মৌখিক চেকলিস্ট	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর কৌশল হিসেবে মূল্যায়ন উপকরণ/টুলস (যেমন, প্রশ্নপত্র, চেকলিষ্ট) প্রস্তুত করবেন এবং পাঠচলাকালীন ব্যবহার করবেন। মনে রাখতে হবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন হতে হবে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। শিক্ষক লিখিত বা মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীর সামনে প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে মৌখিকভাবে প্রশ্নের উত্তর বলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর উত্তর রেকর্ড করবেন। উদাহরণ ১। শিক্ষক বোর্ডে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা এলোমেলোভাবে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। (১ম শ্রেণির উপযোগী) উদাহরণ ২। খেলার মাঠে ৫ জন শিশু খেলছিল। একটুপরে ২ জন শিশু আসল। তার কিছুক্ষণ পর আরও ৩ জন শিশু আসল। (১ম শ্রেণির উপযোগী) । শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীর নিকট জানতে চাইবেন- নতুন করে শিশু আসাতে শিশুর সংখ্যা বেড়েছে নাকি কমেছে? শিক্ষার্থী মৌখিকভাবে উত্তর দিবে।
		লিখিত	প্রশ্নপত্র	শিক্ষক লিখিত বা মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীর সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত উত্তর পরীক্ষা করে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/ফলাবর্তন দিবেন।

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	উপকরণ (টুলস)	উদাহরণ
	করতে হয় এবং কেন তা বুঝতে পারা।			উদাহরণ ১। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি কাগজ সমান ৪ ভাগ করে একভাগ রং করতে বলবেন এবং রং করা অংশটি ভগ্নাংশে লিখতে বলবেন। (৩য় শ্রেণির উপযোগী)
		পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট	শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার নির্দেশনা দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। আবার শিক্ষক শিক্ষার্থীর সমস্যা-সমাধান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে নম্বর প্রদান করবেন। যেমন, উদাহরণ-১: শিক্ষক দুই দল বস্তুর (যেমন, পেন্সিল, বই) আঁকা ছবি দেখিয়েশিক্ষার্থীদের কম-বেশি, বেশি-কম তুলনা করতে দেবেন। (১ম শ্রেণির উপযোগী) [শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ] উদাহরণ-২: শিক্ষক মুখে একটি সংখ্যা (যেমন, ১০১-১০০০ এর মধ্যে) বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের সেই সংখ্যার কার্ড দেখাতে বলবেন। (২য় শ্রেণির উপযোগী) [শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ]
প্রক্রিয়াগত ধারণা	• গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ধাপ সম্পর্কে জানা • ভিন্ন ভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়াা ব্যবহার কৌশল জানা। যেমন- হাতে রেখে ও না রেখে যোগ-বিয়োগ, গুণ, ভাগ ভগ্নাংশের গুণ, ভাগ ইত্যাদি • গাণিতিক কৌশল সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বুঝতে পারা। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে গাণিতিক সমস্যার সমাধানের কৌশল (কোনটি,	মৌখিক	মৌখিক চেকলিষ্ট	উদাহরণ-১: শিক্ষক বোর্ডে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা এলোমেলোভাবে লিখবেন। শিক্ষাথীদের ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হলে কীভাবে তা করবে সে বিষয়ে শিক্ষাথীদের নিকট জানতে চাইবেন। (১ম শ্রেণি) উদাহরণ-৩: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাগজ সরবরাহ করবেন এবং কাগজ কেটে বিভিন্ন আকৃতির চতুর্ভুজ তৈরি করতে বলবেন। (৪র্থ শ্রেণির উপযোগী) [শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ] উদাহরণ-২: খেলার মাঠে ৫ জন শিশু খেলছিল। একটু পরে ২ জন শিশু আসল। তার কিছুক্ষণ পর আরও ৩ জন শিশু আসল। (১ম শ্রেণির উপযোগী)। শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীর নিকট জানতে চাইবেন- মাঠে নতুন করে শিশু আসায় শিশুর সংখ্যা বেড়ে কয়জন হলো? তা কী করে নির্ণয় করবে?
		লিখিত	প্রশ্নপ্রত্র	উদাহরণ ১। শিক্ষক বোর্ডে সমস্যাটি লিখে শিক্ষার্থীদের যোগফল লিখতে দেবেন। ২১ + ৫ =? (১ম শ্রেণির উপযোগী) উদাহরণ ২।এমন একটি সংখ্যা নির্ণয় কর যা দ্বারা ৭২, ১৮০ ও ২৫২ কে ভাগ করলে কোন ভাগশেষ থাকবে না। (৫ম শ্রেণির উপযোগী) উদাহরণ ৩। ছয়টি সংখ্যার গড় ৪২। সংখ্যাগুলোর যোগফল কত? (৫ম শ্রেণির উপযোগী)

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	উপকরণ (টুলস)	উদাহরণ
	কীভাবে করতে হবে তা) সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা।	পর্যক্ষেণ	পর্যক্ষেণ চেকলিষ্ট	উদাহরণ-১: শিক্ষক বোর্ডে 'বড়' এবং 'ছোট' শব্দ দু'টি লিখবেন। একজন করে শিক্ষার্থী বোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে তার হাতে দুটি কার্ড দেবেন যার একটিতে 'বড় সংখ্যা' এবং অন্যটিতে 'ছোট সংখ্যা' লেখা থাকবে। শিক্ষার্থীকে 'বড়' শব্দের নিচে 'বড় সংখ্যা' এবং 'ছোট' শব্দের নিচে 'ছোট সংখ্যা' লেখা কার্ড বসাতে বা ধরতে বলবেন। (৩য় শ্রেণির উপযোগী)
সমস্যা সমাধান	• গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা। • বাস্তব জীবনের সাথে গাণিতিক সমস্যাকে মিল করতে পারা।	মৌখিক	প্রশ্নপত্র	উদাহরণ-১: খেলার মাঠে ৫ জন শিশু খেলছিল। একটু পরে ২ জন শিশু আসল। তার কিছুক্ষণ পর আরও ৩ জন শিশু আসল। এখন মাঠে কতজন শিশু খেলছে? (১ম শ্রেণির উপযোগী) শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্নটির উত্তর মৌখিকভাবে বলতে বলবেন। উদাহরণ-২: একটি ৫০০ টাকার নোটের সাথে কয়টি ১০০ টাকা ও ৫০ টাকার নোট দিলে ১০০০ টাকা হবে? (৩য় শ্রেণির উপযোগী) উদাহরণ-৩: শিক্ষক একটি সম্পূর্ণ ফিতা থেকে কিছু অংশ বাদ দিলে কত অংশ থাকবে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। (৩য় শ্রেণির উপযোগী)
		লিখিত	প্রশ্নপ্রত্র	উদাহরণ-১: একটি খেলার মাঠে ৫ জন শিশু খেলছিল। একটু পরে ২ জন শিশু আসল। তার কিছুক্ষণ পর আরও ৩ জন শিশু আসল। এখন মাঠে কতজন শিশু খেলছে? (১ম শ্রেণি) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপরের সমস্যাটির সমাধান করে দেখাতে বলবেন। উদাহরণ-২: কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৭৫। বছরের শুরুতে ২১৬ জন ভর্তি হলো এবং ৩৫ জন বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেলো। বর্তমানে ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত? (৪র্থ শ্রেণি) উদাহরণ-৩: শিক্ষক নিচের চিত্র-এর মত বোর্ডে ছবি এঁকে ভগ্নাংশের যোগ অঙ্ক শিক্ষার্থীদের খাতায় করতে বলবেন। (৩য় শ্রেণির উপযোগী) 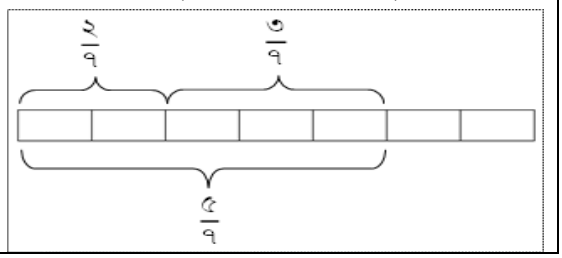

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	উপকরণ (টুলস)	উদাহরণ
		পর্যক্ষেণ	পর্যক্ষেণ চেকলিষ্ট	উদাহরণ-১: শিক্ষক বোর্ডে ১২, ২৪ এবং ৫০ এর গুণনীয়কগুলো লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যা তিনটির গসাগু নির্ণয় করতে বলবেন। (৫ম শ্রেণির উপযোগী) উদাহরণ-২: চিত্রটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ কর। এই ছবিতে কী কী আকৃতি আছে তা সনাক্ত করে লেখ। (২য় শ্রেণির উপযোগী) 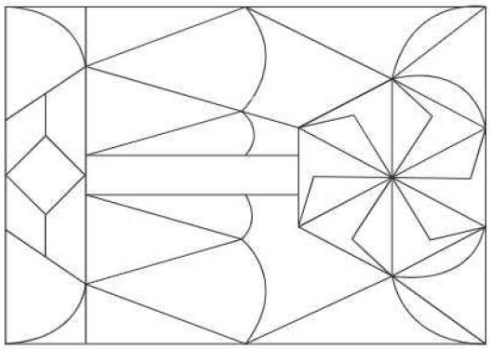

সামষ্টিক মূল্যায়ন কৌশল

প্রাথমিক স্তরে সামষ্টিক মূল্যায়ন সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়নের জন্য একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন কৌশলের ন্যায় সামষ্টিক মূল্যায়নেরও ৫টি অংশ রয়েছে।

সামষ্টিক মূল্যায়নে যা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে -

আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা, লিখিত প্রশ্নপত্র, মৌখিক ও পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট, এসাইনমেন্ট বা অর্পিত কর্ম সম্পাদন, ব্যবহারিক কাজ, হাতে কলমে কাজ, প্রজেক্ট সম্পাদন ইত্যাদি

সামষ্টিক মূল্যায়ন কখন কীভাবে সংঘটিত হয়?

- সামষ্টিক মূল্যায়ন ধারাবাহিক মূল্যায়নের মতো শ্রেণিকার্য চলাকালীন শ্রেণি/বিষয় শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত নয়।
- সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষে অনুষ্ঠিত হবে ।
- সামষ্টিক মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে পরীক্ষার মাধ্যমে সংঘটিত হবে এবং এর ব্যবস্থাপনা বিদ্যালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- পূর্বনির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে/শ্রেণিকক্ষে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে।
- এই মূল্যায়নে সব শিক্ষার্থীর জন্য একই টুলস ব্যবহার করা হবে।
- মূল্যায়ন যে শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে এক বা একাধিক শিক্ষককে পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করবেন। পরিদর্শনকারী শিক্ষকগণ পরীক্ষার নিয়মকানুন বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করবেন।

মূল্যায়ন টুলস প্রণয়ন ও ব্যবহার

শিক্ষার্থীদের কার্যকর গণিত শিখন নিশ্চিত করার জন্য মূল্যায়ন কৌশলের অংশ হিসেব মূল্যায়ন টুলস প্রণয়ন ও কার্যকর ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচের ছকে সামষ্টিক মূল্যায়নের কৌশল দেখানো হলো-

শ্রেণি: ১ম থেকে ৫ম				
মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
গাণিতিক ধারণা	• গাণিতিক সমস্যা সমাধানে কোন ধরনের গাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে তা বুঝতে পারা। যেমন বেশি হওয়া-কম হওয়া, ছোট হওয়া-বড় হওয়া, দূরে-কাছে, অপরিবর্তিত থাকা, বস্তুর আলোকে পরিমাপের একক, জ্যামিতিক আকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা। • গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে কোন কোন গাণিতিক প্রক্রিয়া (যেমন : যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ) ব্যবহার করতে হয় এবং কেন তা বুঝতে পারা।	লিখিত	প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র	সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য টুলস/প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে। (সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নৈর্ব্যক্তিক ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন)
গাণিতিক প্রক্রিয়াগত ধারণা	• গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ধাপ সম্পর্কে জানা • ভিন্ন ভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার কৌশল জানা। যেমন- হাতে রেখে ও না রেখে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ ইত্যাদি। • গাণিতিক কৌশল সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বুঝতে পারা। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে গাণিতিক সমস্যার সমাধানের কৌশল (কোনটি, কীভাবে করতে হবে তা) সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা।	লিখিত	প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র	
সমস্যা সমাধান	• গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা। • বাস্তব জীবনের সাথে গাণিতিক সমস্যার সংযোগ সাধন করতে পারা।	লিখিত	প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র	

গণিত শিখন মূল্যায়নের নমুনা অভীক্ষাপদ (৫ম শ্রেণি)

প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	অভীক্ষাপদ	উত্তর	যোগ্যতা/দক্ষতা
৩. ভগ্নাংশ ও শতকরার ধারণা লাভ করে দৈনন্দিন জীবনে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারা।	৩.৫ দশমিক ভগ্নাংশের ধারণা লাভ করে দৈনন্দিন জীবনে এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারা।	৩.৫.৮ দশমিক ভগ্নাংশের গুণ করতে পারবে। ৩.৫.৬ দশমিক ভগ্নাংশের যোগ করতে পারবে। ৩.৫.১০ দশমিক ভগ্নাংশ সংক্রান্ত দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারবে।	১. ০.১ × ০.১ = কত? ক) ০.০০১ খ) ০.০১ গ) ০.২ ঘ) ১.০০	ক) ০.০০১	গাণিতিক ধারণা
			২. মেহের ও মিরাজ দুই ভাই। মেলায় খেলনা ক্রয়ের জন্য মেহের ২০০ টাকা ও মিরাজ ১৫০ টাকা পেল। পরে তারা প্রত্যেকে তাদের টাকার ০.৫০ অংশ খরচ করলো। কে বেশি খরচ করলো? ক) মেহের খ) মিরাজ গ) উভয়ে সমান ঘ) মিরাজ বেশি মেহের কম	ক) মেহের	প্রক্রিয়াগত ধারণা
			৩. ৪.৫ কেজি আলুর দাম ৪৫ টাকা হলে প্রতি কেজি আলুর দাম কত? ক) ১ টাকা খ) ৪.৫ টাকা গ) ১০ টাকা ঘ) ৪৯.৫০ টাকা	গ) ১০ টাকা	সমস্যা সমাধান
			৪. ২.২৫+২২.৫=কত?	উত্তর: ২৪.৭৫	গাণিতিক ধারণা
			৫. একটি বলপেনের দাম ৪.৫০ টাকা। একটি পেনসিলের দাম ১৩.৫০ টাকা হলে বলপেনের চেয়ে পেনসিলের দাম কত গুণ বেশি?	উত্তর: ৩ গুণ বেশি	প্রক্রিয়াগত ধারণা
			৬. ১২টি খাতার দাম ১২০.৭২ টাকা হলে ৫০.৩০ টাকায় কতটি খাতা কেনা যাবে?	উত্তর: ৫টি	সমস্যা সমাধান
৩. ভগ্নাংশ ও শতকরার ধারণা লাভ করে দৈনন্দিন জীবনে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারা।	৩.৬ শতকরার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা এবং আগ্রহের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের শতকরা সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করা।	৩.৬.৪ দৈনন্দিন জীবনে জনসংখ্যা, লাভ-ক্ষতি ও মুনাফা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে শতকরা ব্যবহার করতে পারবে ।	১. একটি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা এবং বিক্রয়মূল্য ১১০ টাকা হলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে? ২. ক) ১০% লাভ খ) ১০% ক্ষতি গ) ১০% ঘ) লাভ বা ক্ষতি হবে না	ক) ১০% লাভ	গাণিতিক ধারণা
			৩. ১০০ টাকা ১শত দরে লিচু কিনে ৫৫ টাকায় ৫০টি হিসেবে লিচু বিক্রয় করলে এতে লাভ না ক্ষতি হবে? ৪. ক) ৫% লাভ খ) ১০% লাভ গ) ৫ % ক্ষতি ঘ) ১০% ক্ষতি	খ) ১০% লাভ	প্রক্রিয়াগত ধারণা
			৫. একটি কলমের ক্রয়মূল্য ৫০ টাকা। কলমটি ৬০ টাকায় বিক্রয় করা হলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে? ৬. ক) ১০% লাভ খ) ১০% ক্ষতি গ) ২০% লাভ ঘ) ২০ ক্ষতি	গ) ২০% লাভ	সমস্যা সমাধান
			৭. লাভ বলতে কী বুঝায়?	উত্তর: ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য বেশি	গাণিতিক ধারণা
			৮. ২০০ টাকায় ১শত দরে লিচু কিনে ১১০ টাকায় ৫০টি হিসেবে লিচু বিক্রয় করলে এতে লাভ না ক্ষতি হবে?	উত্তর: লাভ	প্রক্রিয়াগত ধারণা
			৮. ২০০ টাকা ১শত দরে লিচু কিনে ২২০ টাকা দরে প্রতিশত লিচু বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?	উত্তর: ১০%লাভ	সমস্যা সমাধান

৬. জ্যামিতিক আকার ও আকৃতির ধারণা লাভ করে প্যাটার্ন অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে পারা এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তা প্রয়োগ করতে পারা।	৬.৩ চতুর্ভুজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বিভিন্ন ধরনের চতুর্ভুজের প্যাটার্ন অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে, পার্থক্য করতে ও আঁকতে পারা ও উৎসাহের সঙ্গে পরিবেশের উপাদানের সঙ্গে বিভিন্নরকম চতুর্ভুজের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা।	৬.৩.২ সামান্তরিকের ধারণা লাভ করে শনাক্ত করতে পারবে। ৬.৩.৩ রম্বসের ধারণা লাভ করে শনাক্ত করতে পারবে।	১. পার্শ্বচিত্রটির নাম কী? ক) আয়ত খ) বর্গ গ) রম্বস ঘ) ট্রাপিজিয়াম	উত্তর: ঘ)	গাণিতিক ধারণা
			১. আয়ত ও সামান্তরিকের মধ্যে নিচের কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? ক) বিপরীত বাহু পরস্পর সমান্তরাল খ) বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান গ) কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান ঘ) বিপরীত কোণগুলোর সমষ্টি সমান	উত্তর: ক)	প্রক্রিয়াগত ধারণা
			১. নিচের কোনটি সাধারণত আয়তাকৃতির নহে? ক) বই খ) দরজা গ) ব্ল্যাকবোর্ড ঘ) মোমবাতি	উত্তর: ঘ) মোমবাতি	সমস্যা সমাধান
			১. রম্বস কাকে বলে?	উত্তর:	গাণিতিক ধারণা
			১. একটি বর্গকে কী পরিবর্তন করলে তাকে শুধুই রম্বস বলা যাবে?	উত্তর:	প্রক্রিয়াগত ধারণা
			১. প্রতিটি বগই রম্বস কিন্তু প্রতিটি রম্বস বর্গ নয় -ব্যাখ্যা কর।	উত্তর:	সমস্যা সমাধান

গণিত শিখন মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের গাণিতিক ধারণা, প্রক্রিয়াগত ধারণা, সমস্যা সমাধান দক্ষতা এবং বিশ্লেষণী চিন্তাশক্তি কতটা বিকশিত হয়েছে তা নির্ণয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কার্যকর মূল্যায়ন কেবল নম্বর প্রদানই নয়; বরং শিক্ষার্থীর শিখন-শেখানো অগ্রগতি নির্ধারণ, ভুল ধারণা শনাক্তকরণ এবং পরবর্তী শিখন-শেখানো কৌশল উন্নয়নে সহায়তা করে। নিয়মিত ও বহুমাত্রিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীকে গণিত শেখায় আরও সক্রিয়, আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর করে তোলে। বিশেষত, শিখনের ধারাবাহিক ফলাবর্তন (feedback) প্রদান ও ব্যক্তিগত সহায়তা শিক্ষার্থীর গণিত শেখার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই গণিত শিখন মূল্যায়ন একটি চলমান, গঠনমূলক এবং শিখন-সহায়ক প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীর প্রকৃত গণিত দক্ষতা উন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলন

১। মূল্যায়ন কী? মূল্যায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করি।
২। গাণিতিক ধারণা. প্রক্রিয়াগত ধারণা ও সমস্যা সমাধান দক্ষতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করি।
৩। ধারবাহিক/সামষ্টিক মূল্যায়নের টুলস প্রণয়নের জন্য বিবেচ্য বিষয় কী কী হবে?

এসাইনমেন্ট

১। ইনস্ট্রাক্টর কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর ধারাবাহিক মূল্যায়ন কৌশল বিবেচনায় শিক্ষার্থীগণ ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য টুলস তৈরি করবেন।
২। ইনস্ট্রাক্টর কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীগণ সামষ্টি মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন/অভীক্ষাপদ তৈরি করবেন।

অধ্যায় ১৫
পাঠ পরিকল্পনা

যেকোনো কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে কার্য সম্পাদনের জন্য যথাযথ পূর্বপরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের রূপরেখাই হলো পরিকল্পনা। যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে তা অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পিত হতে হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটান। শিক্ষক আগে থেকেই পরিকল্পনা করবেন তিনি কী শেখাবেন? কেন শেখাবেন? কীভাবে শেখাবেন? এই অধ্যায়ে পাঠ পরিকল্পনার ধারণা, গুরুত্ব, উপাদান, প্রণয়ন ও উন্নয়ন এবং তা ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ পরিকল্পনা কী?

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের একাট বিষয়বস্তুর উপর শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত লিখিত রূপটি হলো দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা। পরিকল্পিত শিখন-শেখানো কার্যক্রম হচ্ছে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক, নির্ভুল ও সযত্নে তৈরিকৃত পাঠ পরিকল্পনাই পারে শিখনফল অনুসারে শিক্ষার্থীর শিখনকে নিশ্চিত করতে। সুষ্ঠু পাঠ পরিকল্পনা একজন শিক্ষককে তাঁর পাঠের প্রতিটি ধাপ মানসপটে দেখতে অগ্রিম সাহায্য করে, ফলে শিক্ষক ভালো প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং তিনি সফলভাবে তার শিখন-শেখানো কর্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। পাঠ পরিকল্পনা একজন শিক্ষককে তাঁর পূর্ববর্তী পাঠের ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করার জন্য তথ্য সরবরাহ করে যা তাঁর পরবর্তী পাঠকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব

পাঠ পরিকল্পনা হলো শিখন-শেখানোর বিষয়বস্তুর ওপর প্রণীত পূর্ব পরিকল্পনা। শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও চাহিদা সনাক্তকরণ, সংশ্লিষ্ট পাঠের উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ নির্ধারণ, পাঠের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাক্রমের সাথে এর যোগসূত্র স্থাপন, পাঠদানের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি ও এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাজের সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা আবশ্যক। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে একজন শিক্ষক নির্ধারিত বিষয়ের নির্ধারিত বিষয়বস্তু যৌক্তিক ও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। কাজেই একজন শিক্ষকের জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে-

- শেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সফল করে তোলা যায়।
- শিক্ষার্থীদের শিখনকে যথার্থ ও কার্যকর করতে সহায়তা করা যায়।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।
- শিখন-শেখানোর উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ সম্ভব হয়।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে কর্মতৎপর থাকে।
- পাঠের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।
- শিখন-শেখানোর বরাদ্দকৃত সময়কে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।
- বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করা যায়।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কার্যকরভাবে প্রশ্ন করা যায়।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন এবং শেষে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করা যায়।
- অপারগ শিশু সনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

গণিত পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. শিক্ষার্থী সম্পর্কে জ্ঞান

- শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে কতটুকু জানে।
- শিক্ষার্থীর কোনো ভুল ধারণা আছে কিনা।
- শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানা।

২. শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জ্ঞান

- পাঠের মাধ্যমে অর্জিত যোগ্যতা ও শিখনফল জ্ঞান।

৩. পাঠের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি

- সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বিমূর্ত নাকি মূর্ত?
- বস্তু, চিত্র, উদাহরণ, সমস্যা সমাধান, অনুশীলন ইত্যাদির কোন কোনটি প্রয়োজন?

৪. শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কৌশল যেমন, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ, হাতে-কলমে কার্যক্রম, সমস্যাভিত্তিক শিখন।
- গণিতে দৃশ্যায়ন (visualization), মডেল, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিকল্পনা।
- বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতি নির্বাচন। যেমন, আরোহী, অবরোহী, সমস্যা সমাধান, আবিস্কার ইত্যাদি।

৫. শিখন-শেখানো উপকরণ

- বস্তু, চার্ট, জ্যামিতিক সরঞ্জাম, ডিজিটাল টুল, মাল্টিমিডিয়া - কোনগুলো ব্যবহার করবেন?

৬. শিখন-শেখানোর ধাপ

- প্রস্তুতি ⟶ উপস্থাপন ⟶ অনুশীলন ⟶ মূল্যায়ন ⟶ পুনরালোচনা ও সারসংক্ষেপকরণ ।
- সময় ব্যবস্থাপনা ও ধাপে ধাপে শিখন নিশ্চিত করা।

৭. দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংযোগ স্থাপন

- গণিত ধারণাকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা বা উদাহরণের সঙ্গে যুক্ত করা।

৮. মূল্যায়ন কৌশল

- গাঠনিক মূল্যায়ন: মৌখিক, লিখিত, অনুশীলন, টেস্ট ইত্যাদি

৯. প্রতিফলন

- কী কী কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে?
- কোথায় কোথায় সমস্যা হয়েছে?
- কী কী উন্নয়ন করা প্রয়োজন?
- শিখন-শেখানো কৌশল শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ছিল কিনা?

গণিত পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ

১. পরিচিতি

এই অংশে শ্রেণি, বিষয়, সময়, পাঠের শিরোনাম ইত্যাদির তথ্য প্রদান করা হয়, যেগুলোকে ভিত্তি করে শিক্ষক সমগ্র পাঠের পরিকল্পনা করতে পারেন।

২. শিখনফল

পাঠদান প্রক্রিয়ায় মূল চাবিকাঠি হলো শিখনফল বা আচরণিক উদ্দেশ্য। পাঠের শেষে শিক্ষার্থীর আচরণে অর্থাৎ তার চিন্তায়, অনুভূতিতে, দক্ষতায় কি ধরণের পরিবর্তন শিক্ষক আশা করেছেন তা উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে। পাঠের শিখনফল সুনির্দিষ্ট করা থাকলে শিক্ষক কি কি করবেন, কীভাবে করবেন এবং কিভাবে করলে শিক্ষার্থী সহজে ও আনন্দদায়কভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন অর্জন করতে পারবে, তা স্থির করা সম্ভব হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম -এ প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য শিখনফল নির্ধারণ করা রয়েছে। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় শিক্ষাক্রম থেকে শিখনফল সংগ্রহ করতে হবে।

৩. উপকরণ

শিক্ষককে তার পাঠের বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার করতে হবে। আকর্ষনীয় এবং পাঠের সঙ্গে সম্পতিপূর্ণ উপকরণ ব্যবহার করলে তা শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও আগ্রহকে ধরে রাখতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সহজলভ্য ও স্বল্প বা বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করা উত্তম। কাগজ, কলম, কাঁচি এবং স্কেল দিয়ে তৈরি করা যায় এমন সব শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু বাস্তব উপকরণ যেমন, কাঠি, স্ট্র, বোতলের ছিপি, মার্বেল, বল এবং পানির বোতল ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার দরকার হতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন উপকরণসমহূ কম দামের এবং একবার তৈরি করা হলে বারবার ব্যবহার করা যায়।

৪. প্রস্তুতি

প্রস্তুতি অংশে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রথম মানসিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এই সম্পর্ক বন্ধুসুলভ এবং সৌহার্দপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এজন্য প্রথমেই শ্রেণির পরিবেশকে সহজ ও ভীতিমুক্ত করতে হবে। অত:পর শিক্ষককে শ্রেণিবিন্যাস এবং শ্রেণির পরিবেশ শিখনের উপযোগী করতে হবে। নতুন পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের রয়েছে কি না, প্রশ্নের মাধ্যমে বা আলোচনার মাধ্যমে জেনে নিতে হবে। প্রস্তুতি থেকে অনেক শিক্ষার্থী নতুন পাঠের বিষয়বস্তু আন্দাজ করতে পারবে। যদি না পারে তবে শিক্ষককে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে মিল করে নতুন পাঠের ঘোষণা দিয়ে নতুন পাঠের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট করে শিক্ষার্থীদের বলে দিতে হবে।

৫. উপস্থাপন

পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ । এই অংশই হচ্ছে শিক্ষার্থীর জ্ঞানভান্ডারকে নতুন করে জ্ঞানের সম্ভার দিয়ে সমৃদ্ধশালী করার জন্য পরিকল্পিত। নতুন ধারণা দান করার জন্য শিক্ষক দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন উদাহরণ দিতে পারেন, সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যা অনুযায়ী বিভিন্ন রকম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে পারেন এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যবহারিক কাজের অনুশীলন করাতে পারেন। সর্বোপরি, এই অংশে শিক্ষক, শিক্ষার্থী তাদের নিজ নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরও নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রয়াসী হবেন।

৬. মূল্যায়ন

এই অংশে শিক্ষক দেখবেন তিনি যে শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ শুরু করেছিলেন তা কতটা অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্ন করে, শিক্ষার্থীদের আলোচনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে, বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে দিয়ে, কাজ করতে দিয়ে মূল্যায়ন করতে পারেন। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে অর্জিত শিখন বাড়ির কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারেন। তবে প্রাথমিক স্তরে জ্ঞান অর্জন, উপলব্ধি, প্রয়োগ উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি, শিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা এবং শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের যথার্থতার বিবেচনায় পাঠের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে শুধমুাত্র দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনকেই এখানে গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়, বরং শ্রেণির শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও উন্নয়ন

নমুনা পাঠপরিকল্পনা (৪র্থ শ্রেণি)

পাঠ: গুণিতকের নির্ণয় পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৮২-৮৩

শিখনফল

২.৮.৫ গুণিতক কী তা বলতে পারবে।

২.৮.৬ উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যার গুণিতক নির্ণয় করতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি, স্থানীয়মানের চার্ট, কাগজ, কলম, মার্কার, পোস্টার পেপার, নমিনেশন স্টিক

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

(শিক্ষক সহায়িকায় প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও মূল্যায়ন ধাপগুলো শিখন-শেখানো কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে)

১. সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে পাঠ শুরু করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্ব পাঠের শিখন স্মরণ করতে বলবেন। বোর্ডে ৮, ১২, ১৬, ২০ সংখ্যাগুলো লিখবেন এবং সবগুলো সংখ্যা কোন কোন সংখ্যার গুণিতক তা বের করতে বলবেন। নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের উত্তর বোর্ডে লিখতে সহায়তা করবেন। সকল শিক্ষার্থী পূর্ব পাঠের শিখন স্মরণ করতে ও সংখ্যাগুলো কোন কোন সংখ্যার গুণিতক তা বের করতে পারছে।

৩. আজও আমরা বিভিন্ন সংখ্যার গুণিতক নির্ণয় সম্পর্কে শিখব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন এবং বোর্ডে পাঠের শিরোনাম গুণিতক নির্ণয় লিখবেন।

৪. পাশাপাশি বসা শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮২ এর অনুশীলন ২ পেনসিল ব্যবহার করে নিজ নিজ পাঠ্যপুস্তকে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন। তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। কাজ শেষ হলে যেকোনো একটি দলকে ৫ এর গুণিতক বের করার কাজ সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে সহায়তা করবেন এবং অন্যান্যদের তাদের কাজ মিলিয়ে নিতে বলবেন। প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে সকল দলের শিক্ষার্থী সঠিকভাবে সংখ্যা চার্টে ৫ এর গুণিতকগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছে নিশ্চিত হবেন। এরপর অন্য একটি দলকে ৭ এর গুণিতক বের করার কাজ সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে সহায়তা করবেন এবং অন্যান্যদের তাদের কাজ মিলিয়ে নিতে বলবেন। সকল শিক্ষার্থী সঠিকভাবে সংখ্যা চার্টে ৭ এর গুণিতকগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছে নিশ্চিত হবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের এককভাবে তাদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠার অনুশীলন ৩ এর উত্তর পেনসিল দিয়ে লিখতে বলবেন। তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

৬, শিক্ষার্থীদের এককভাবে তাদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠার অনুশীলন ৪, ৫, ৬ ও ৭ এর উত্তর নির্দেশনা মাফিক পেনসিল দিয়ে সম্পন্ন করতে বলবেন। তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। সকল শিক্ষার্থী পেনসিল ব্যবহার করে বইয়ে অনুশীলনগুলো সম্পন্ন করেছে নিশ্চিত হবেন।

৭. শিক্ষার্থীদের নতুন চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন-

- ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে ৭ এর গুণিতক কয়টি?

শিক্ষার্থীদের চিন্তা করে সমস্যাটি সমাধানের জন্য ৫ মিনিট সময় দিবেন এবং এককভাবে সমাধানে উৎসাহিত করবেন। যথাযথ উপায়ে সমস্যাটির সমাধান করতে পেরেছে নিশ্চিত হবেন এবং সবার আগে সম্পন্ন করা ২-৩ জন শিক্ষার্থীকে তাদের কাজ সকলের উদ্দেশ্যে বিনিময় করতে দিবেন।

৮. সময় থাকলে অনুরূপভাবে ভিন্ন সংখ্যার গুণিতক বের করতে দিবেন। যেমন,

- ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে ৬ এর গুণিতক কয়টি?
- ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে ৮ এর গুণিতক কয়টি?

৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন এই পাঠ থেকে আমরা কী শিখলাম। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সাথে মিল করে পাঠের সারসংক্ষেপ করবেন এবং পাঠের অর্জন ঘোষণা করবেন। পরবর্তী পাঠে আমরা বিভিন্ন সংখ্যার গুণনীয়ক নির্ণয় সম্পর্কে জানব বলবেন এবং সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

অনুশীলন: ১ম-৫ম শ্রেণির গণিতের যেকোনো বিষয়বস্তুর উপর একটি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করি।

পাঠ পরিকল্পনা উন্নয়ন

একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেই তা সকল শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনে যথাযথ পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি পাঠ পরিকল্পনারই উন্নয়নের ক্ষেত্র রয়েছে। তাই পাঠ পরিকল্পনাটি দলে উপস্থাপন ও আলোচনা করে এর উন্নয়ন করা সম্ভব। নিচে পাঠ পরিকল্পনা উন্নয়নের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা **হলো**-

১. সহপাঠীদের সামনে উপস্থাপন ও আলোচনা
২. রুব্রিক ব্যবহার করে পর্যালোচনা
৩. মডেল পাঠ পরিকল্পনার আলোকে বিশ্লেষণ
৪. গঠনমূলক ফিডব্যাক
৫. সংশোধন ও পরিমার্জন

পাঠ প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন

প্রণীত পাঠপরিকল্পনা অনুসরণ করে পাঠ প্রদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে একজনকে শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করি। পাঠপরিকল্পনা অনুসারে উপকরণ তৈরি/সংগ্রহ করি এবং পাঠ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। অন্যান্য শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষক পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুতি নিবেন।

পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষকগণের করণীয়-

১. প্রস্তুতি পর্যায়

- পর্যক্ষেণের উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়া
- কী কী পর্যবেক্ষণ করতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেওয়া
- পাঠ পরিকল্পনা পড়ে নেওয়া

২. পাঠ চলাকালীন পর্যবেক্ষকগণের করণীয়

- নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা
- পর্যবেক্ষকরা নিম্নোক্ত দিকগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখবেন-
  - ✓ শিখনফল অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম
  - ✓ শিক্ষণ-পদ্ধতি ও কৌশল
  - ✓ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তা
  - ✓ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা
  - ✓ শিক্ষণ উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহার
  - ✓ ধারণার ব্যাখ্যা ও স্পষ্টতা
  - ✓ প্রশ্ন করার দক্ষতা
  - ✓ মূল্যায়নের ধরন
- মন্তব্য নয়-তথ্য লিপিবদ্ধ করা
- পাঠে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা
- কথা না বলা
- শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত না করা
- শিক্ষককে স্বাভাবিকভাবে পাঠ পরিচালনা করতে দেওয়া

পাঠ মূল্যায়নের জন্য রুব্রিক

শিখন-শেখানো (Teaching–Learning) কার্যক্রমের মানোন্নয়ন ও পর্যবেক্ষণে রুব্রিক অত্যন্ত কার্যকর একটি মূল্যায়ন সরঞ্জাম। এর মাধ্যমে একটি পাঠে শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা, উপস্থাপন, শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, ব্যবহৃত কৌশল, উপকরণ, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন—সবকিছুই সুস্পষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার করা যায়।

ক্যাটাগরি		স্কোর				
		নিম্নের ১-৫ এর বর্ণনা থেকে যে কোন একটি বাছাই করতে হবে				
		১	২	৩	৪	৫
A	পাঠের অভিপ্রেত শিখনফল এবং অর্জিত শিখনফলের মধ্যে সম্পর্ক	সংগতিবিহীন শিখনফল নির্ধারণ এবং শিক্ষাক্রমের শিখন ফলের আলোকে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন/ পরিচালনা না করা। শিক্ষাক্রমের শিখনফলের সাথে সংগতিবিহীন শিখনফল অর্জন বা কোন শিখনফলই অর্জন না করা।	বোধগম্য শিখনফল নির্ধারণ করা। শিক্ষাক্রমের শিখনফল সামান্য বিবেচনায় নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা/পরিচালনা করা। শিক্ষাক্রমের শিখনফলের সাথে আংশিক সংগতিপূর্ণ শিখনফল অর্জন করা।	সুস্পষ্ট শিখনফল নির্ধারণ করা। শিক্ষাক্রমের শিখনফল অনুসরণে পাঠ পরিকল্পনা/পরিচালনা করা। শিক্ষাক্রমের শিখনফলের সাথে সংগতিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য শিখনফল অর্জন করা।	সুস্পষ্ট শিখনফল নির্ধারণ করা। শিক্ষাক্রমের শিখনফল অনুসরণে পাঠ পরিকল্পনা/পরিচালনা করা। শিক্ষাক্রমের শিখনফলের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ শিখনফল অর্জন করা।	শিক্ষাক্রমের আলোকে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং অর্জনযোগ্য শিখনফন নির্ধারণ করা। শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে যথাযথভাবে পাঠ পরিকল্পনাপ্রণয়ন/ পরিচালন করা এবং উচুমাত্রায় শিখনফল অর্জন করা।
B	শিখন প্রক্রিয়া (ধাপসমূহ এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাছাই এর মধ্যে সংযোগ)	শিখন-শেখানোর ধাপসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় না রাখা। শিখন প্রক্রিয়ায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করতে না পারা।	শিখন-শেখানোর ধাপসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুটা কিছুটা বজায় রাখা। শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে-এ বিষয়টি আংশিক বিবেচনায় আনা। শিখন প্রক্রিয়ায় সকল শিশুকে সম্পৃক্ত না করা।	শিখন-শেখানোর ধাপসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে বজায় রাখা। শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে - এ বিষয়টি বিবেচনায় আনা। শ্রেণীর বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	শিখন-শেখানোর ধাপসমূহের যথাযথভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা। শিখন প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিখতে উৎসাহিত করা।	শিখন-শেখানোর ধাপসমূহের যথাযথভাবে ও স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক বজায় রাখা। পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা। শিখনে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
C	শিক্ষার্থীর চিন্তন ও শিখনের সুযোগ	শিক্ষক কর্তৃক বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাতেই বেশিরভাগ সময় ব্যয় করা। পাঠ্যপুস্তক বর্ণিত নতুন শব্দ এবং ধারণা শিক্ষার্থীদের পড়তে এবং/অথবা মুখস্ত করতে দেওয়া। কোন সমস্যা নিয়ে শিক্ষার্থীদের কদাচিৎ চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া।	শিক্ষার্থীদের নিজস্ব জ্ঞান ও ধারণা প্রকাশের সামান্য সুযোগ দেওয়া। পাঠে যা কিছু শেখানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের তা মুখস্থ বলতে দেওয়া। পূর্বে শেখানো বা পরিচিত কোন পদ্ধতি (Procedure) অনুসরণে সম্পন্ন করা যায় এমন কিছু কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দেওয়া।	শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ধারণা প্রকাশের জন্য কিছু পরিমাণ সুযোগ দেওয়া। শিক্ষার্থীদের অপেক্ষাকৃত কঠিন (Challenging) কিন্তু তাদের সামর্থ্যের মধ্যে সমাধান করা সম্ভব এমন কাজ দেওয়া।	শিক্ষার্থীদের অপরিচিত, অপেক্ষাকৃত কঠিন (Challenging) প্রশ্ন/সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া। প্রদত্ত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা অনুসরণ এবং উপসংহারে পৌঁছতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।	শিক্ষার্থীদের একক এবং/বা যৌথ উদ্যোগে কোন প্রশ্ন/সমস্যা তৈরী করতে, সে প্রশ্নের উত্তরের/সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা অনুসরণ এবং উপসংহারে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

ফলার্বতন প্রদান কৌশল

পাঠ পর্যবেক্ষণের পর পর্যবেক্ষকগণ পাঠের মানোন্নয়নের জন্য পাঠের উপর আলোচনার আয়োজন করবেন। আলোচনা ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে পাঠের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। স্টিভেন মিনজ ফলাবর্তনকে গঠনমূলক করার ছয়টি উপায় নির্ধারণের ধারণা দিয়েছেন। সেগুলো হলো-

ধাপ-১: প্রথমেই ফলাবর্তনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা

ধাপ-২: পর্যবেক্ষিত বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা

ধাপ-৩: প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা

ধাপ-৪: শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া, ধারণা, অনুচিন্তন ইত্যাদি বলার সুযোগ প্রদান করা

ধাপ-৫: পারস্পরিক মতামত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা

ধাপ-৬: আলোচনার সারসংক্ষেপ করা এবং সহায়তার উপায় ব্যাখ্যা করা

উপরোক্ত উপায়গুলো বিবেচনায় এনে ফলাবর্তন আলোচনার ক্ষেত্রে-

- ফলাবর্তন প্রদানের সময় প্রশংসা দিয়ে শুরু করা, যেমন: আপনার পাঠ সুন্দর হয়েছে। পাঠের যেই দিকগুলো ভালো ছিলো তা তুলে ধরা ইত্যাদি।
- শিক্ষকের অনুচিন্তন প্রকাশে সহায়তা করা। যেমন: আপনার ভাবনা কী? কেন এভাবে করলেন?
- নির্দিষ্ট একটি করে ইস্যু নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া;
- পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণকারী সকলকে ফিডব্যাক প্রদানের সুযোগ দেওয়া;
- আলোচনার সময় একজনকে পরামর্শগুলো নোট করতে সহায়তা করা;
- আলোচনার সারসংক্ষেপ করা এবং পরবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করা;
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা শেষ করা।

পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পাঠ প্রদর্শন একটি সমন্বিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঠপরিকল্পনা শিক্ষককে বিষয়বস্তুর গভীরতা অনুধাবন, উপযুক্ত কৌশল নির্বাচন এবং শিক্ষার্থীর শেখার প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যক্রম সাজাতে সহায়তা করে। পরিকল্পনা প্রণয়নের পর এর উন্নয়ন প্রক্রিয়া পাঠের কার্যকারিতা বাড়ায় যেখানে সূক্ষ্ম-অনুচিন্তন, পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও পাঠ প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষককে পরিকল্পিত কৌশল বাস্তবে প্রয়োগের দক্ষতা অর্জনে এবং পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পাঠ আরও উন্নয়ন করে পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

আলী, আ., রায়, স., বানু, হা., & উদ্দিন, জা., (২০১২), *সি এড প্রোগ্রাম (গণিত),* বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বানু, হা., ভুইয়া, ই., & আমিন, শে., (২০০২), *সি-ইন-এড (গণিত),* জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৫), *প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (পরিমার্জিত ২০২৫),* এনসিটিবি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৫), *৪+ এবং ৫+ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (পরিমার্জিত ২০২৫),* এনসিটিবি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৫), *প্রাথমিক গণিত (১ম শ্রেণি),* এনসিটিবি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৫), *প্রাথমিক গণিত (২য় শ্রেণি),* এনসিটিবি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৫), *প্রাথমিক গণিত (৩য় শ্রেণি),* এনসিটিবি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৫), *প্রাথমিক গণিত (৪র্থ শ্রেণি),* এনসিটিবি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৫), *প্রাথমিক গণিত (৫ম শ্রেণি),* এনসিটিবি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৪), *প্রাথমিক গণিত শিক্ষক সহায়িকা (১ম শ্রেণি),* এনসিটিবি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৪), *প্রাথমিক গণিত শিক্ষক সহায়িকা (২য় শ্রেণি),* এনসিটিবি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০২৪), *প্রাথমিক গণিত শিক্ষক সহায়িকা (৩য় শ্রেণি),* এনসিটিবি

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, (২০১৯), *ডিপিএড প্রাথমিক গণিত (বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান),* নেপ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, (২০২৫), *পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) প্রাথমিক গণিত,* নেপ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, (২০১৯), *প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন নির্দেশিকা,* এনসিটিবি

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, (২০১৬), *যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন ও মূল্যায়ন,* নেপ

Charles, R. I., & Lester, F. K. (1982). *Teaching problem solving: What, why & how*. Addison-Wesley.

De Lange, J. (2003). Mathematical literacy for living from OECD–PISA perspective. In B. L. Madison & L. A. Steen (Eds.), *Quantitative literacy: Why numeracy matters for schools and colleges* (pp. 75–89). National Council on Education and the Disciplines.

JICA. (2004). *Manual of the teaching of Science and Mathematics in Basic School,* STM Project.

Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). *Adding it up: Helping children learn mathematics*. National Academy Press.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). *Principles and standards for school mathematics*. NCTM.

Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2018). *Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally* (10th ed.). Pearson.